তারা একদিন ভালোবেসেছিল

শ্রীনবগোপাল দাস

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : সুরেশ চন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড্
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মাঘ, ১৩৪৭
পাঁচ সিকা

কলিকাতা, ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের—জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের অবিনাশ প্রেস হইতে সুরেশ চন্দ্র দাস, এম-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দিদিকে

সূচীপত্র

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

সুশান্ত আর শিপ্রা।

বিধাতাপুরুষের অলক্ষিত হাতের স্পর্শকে তাহারা কেহই প্রথম জীবনে মানিতে চায় নাই, কিন্তু তাঁহার বিধান যে সাধারণ মানুষের অনধিগম্য তাহা তাহাদের জীবনে যতখানি প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল বোধ হয় আর কাহারও জীবনে কখনও ততখানি হয় নাই।

তাহাদের প্রথম পরিচয় হয় অনেকটা গতানুগতিকভাবে, অর্থাৎ, কুড়ি বছর আগে যদিও এইভাবে পরিচয় হওয়াটা গতানুগতিক ছিল না, আজকালকার রোম্যান্সের বাজারে ইহাকে নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার ছাড়া আর কোন পর্য্যায়ভুক্ত করা বোধ হয় চলে না!

সুশান্ত মামার বাড়ীতে মানুষ। তাহার মামীমা এবং শিপ্রার মা ছিলেন অন্তরঙ্গ সখী। তাই উভয়ের বাড়ীতেই ছেলেমেয়েদের আনাগোনা ছিল অব্যাহত।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

সুশান্ত অধিকাংশ সময়ই তাহার কলেজ নিয়া ব্যস্ত থাকিত। সেখানকার তর্কসভায় সে ছিল মস্ত বড় একজন পাণ্ডা। তাহার অবসর মিলিত রবিবারে, আর ছুট্‌কোছাট্‌কা ছুটির দিনে।

এমন একটা ছুটির দিনে সে শিপ্রাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহার মামীমার সন্ধানে।

চাকরের নির্দ্দেশমত ঘরের পুরানো মলিন পর্দ্দাটা সরাইয়া দিয়া ঢুকিতে যাইবে, এমন সময় সে থমকাইয়া দাঁড়াইল। কোলের কাছে একটা মাসিক কাগজ নিয়া উদাসভাবে বাইরের খোলা আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিল শিপ্রা। প্রশান্ত দেখিতে পাইয়াছিল শুধু তাহার গ্রীবাভঙ্গী, আর সেই গ্রীবাকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল যে অলকগুচ্ছ তাহারই যেন একটা ছায়া।

ঘরে অপরিচিতা একটি মেয়ে বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহার মামীমা সেখানে নাই দেখিয়া সুশান্ত ফিরিয়া যাইতেছিল।

এইখানেই হয়ত আমাদের গল্পের যবনিকাপাত হইত, কিন্তু সুশান্ত এবং শিপ্রার জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী সকলকে শুনিতে হইবে বলিয়াই বোধ হয় সেই সময় সুশান্তর মামীমা পাশের বাড়ী হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

—সুশান্ত নাকি? আমার খোঁজে এসেছিলি বুঝি? তা চলে যাচ্ছিস্ কেন?

সুশান্ত থতমত খাইয়া বলিতে যাইতেছিল সে চলিয়া যায় নাই, কিন্তু মামীমা তাহার জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়াই বলিয়া চলিলেন, বিনির সাথে দেখা কর্‌তে এসেছিলাম, শিপ্রা বল্‌লে পাশের বাড়ীতে আছে, তাই সেখানেই চলে গিয়েছিলাম। ওদের ছেলেটির বড্ড

অসুখ, বিনিকে আবার ছোটমা বলে ডাকে, কিছুতেই চলে আস্তে দিচ্ছে না।

বিনি অর্থাৎ বিনোদিনী শিপ্রার মা, সুশান্তর মামীমার সখী।

—তা শিপ্রা কোথায় গেল? একটা পান অন্ততঃ মুখে দিতে পার্লে বড্ড ভালো লাগ্ত!

বলিতে বলিতে তিনি শিপ্রা যে ঘরে ছিল সেখানে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই সুশান্তকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই বাইরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ভেতরে আয় না?

বলা বাহুল্য, সুশান্তকে শান্ত সুবিনীত ছেলের মত শিপ্রার ঘরে ঢুকিতে হইল।

এই প্রথম সে শিপ্রাকে মুখোমুখি দেখিল। চেহারার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই, কিন্তু মুখখানি অত্যন্ত কোমল। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, হাত দু'খানি নিটোল, বেশভূষা আড়ম্বরবিহীন।

শিপ্রা ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে।

সুশান্তর শিপ্রাকে ভালো লাগিল।

সুশান্তর মামীমা উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন।—এ হচ্ছে আমার ভাগ্নে সুশান্ত, সব সময় কলেজ আর বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত; আর এ হচ্ছে শিপ্রা, যে ক্লাশের বই-এর ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষ্তে চায় না, তবে অত্যন্ত লক্ষ্মী মেয়ে, তা' স্বীকার করতেই হবে।

সুশান্ত ছোট্ট একটি নমস্কার করিল। শিপ্রা যে প্রতিসম্ভাষণ করিল তাহাকে নমস্কার বলিলে ভুল করা হইবে। সে যেন সুশান্তকে আহ্বান করিয়া বলিল, ওঃ আপনিই সুশান্তবাবু, যার কথা মাসীমার মুখে রাতদিন লেগেই আছে?

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

সুশান্তই প্রথমে কথা বলিল।

—আপনি অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, বাড়ীতে আর কেউ ছিল না, তাই আপনাকে বিরক্ত না ক'রে চলে যাচ্ছিলাম।

শিপ্রা জবাব দিল :

—পড়ায় আমার মন বসে না কিছুতেই, এসব নীরস জিওমেট্রি আর ধাতুরূপ শব্দরূপের যেন শেষ নেই। আদিহীন, অন্তহীন স্রোতে চলেছে এরা, আমরাও ভেসে চলি এদের সাথে।···আনন্দ পাই নে।

—আপনার প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। পরীক্ষার বিভীষিকা যে কি জিনিষ তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউই বুঝ্তে পারে না। আমার এখনও একটা পরীক্ষা বাকী—তবে এটাই শেষ, অন্ততঃ আমার দৃঢ় সংকল্প, এর পর আর কোন পরীক্ষার দুয়ার মাড়াব না।

আপনারা আশা করি বুঝিয়াছেন সুশান্ত এম্-এ ক্লাশে পড়ে।

এই ভাবে তাহাদের প্রথম পরিচয়। ইহার পর প্রতি ছুটির দিনেই সুশান্ত আসিতে সুরু করিল শিপ্রার পড়া বলিয়া দিতে। তাহাদের পরস্পরের সম্বোধন সহজ হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল সুশান্তদা ও শিপ্রাতে।

যতদিন শিপ্রার পরীক্ষার তাড়া ছিল ততদিন সময়টা এক রকম ভালই কাটিয়াছিল। শিপ্রা মেধাবী ছাত্রী নয়, তবু তাহাকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করিতেই হইবে, সুশান্তর এই সংকল্প ছিল। তাহার অধ্যবসায়ে এবং শিপ্রার চেষ্টায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিপ্রার নামও দেখা গেল।

কিন্তু পরীক্ষা শেষ হইবার পর অখণ্ড অবসর যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখনই জটিলতার সৃষ্টি হইতে সুরু করিল। যে সুশান্ত এতদিন কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকের মত শিপ্রাকে জ্যামিতির দুরূহ তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল সে শিপ্রার সাথে আরম্ভ করিল কাব্যচর্চ্চা। আর শিপ্রাও পরীক্ষার প্রহেলিকা হইতে ক্ষণিক নিষ্কৃতি পাইয়া গভীর উৎসাহে কাব্যালোচনায় যোগ দিল।

কাব্য সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই সঙ্কীর্ণ। সত্য কথা বলিতে কি, কাব্যরসের মধুর আস্বাদ আমি কোন দিনই উপভোগ করিতে পারি নাই, কিন্তু কবিতার বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি তীব্র অভিযোগ আছে, যাহা আমি সুশান্ত-শিপ্রার জীবন হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। আমার মনে হয় ইতিহাস বা দর্শনের মধ্যে যে একটা আভিজাতিক ছন্দ আছে, কাব্যের মধ্যে তাহা নাই: কাব্য হইতেছে স্ফটিক স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর মত; ইহার স্পর্শে তরুণতরুণীর অঙ্গে লাগে মাতলামি, ইহার আবর্ত্ত তাহাদিগকে পরিণত করে অতি তুচ্ছ ক্রীড়াবস্তুতে।

সুশান্ত-শিপ্রার অবসর জীবনেও কাব্য এই অনর্থের সৃষ্টি করিল। ব্রাউনিং-এর সনেট্ আর শেলীর লিরিক্-এর মধ্য দিয়া তাহারা পরস্পরকে পরস্পরের কাছে ধরা দিয়া বসিল। সুশান্তর কোলে মাথা রাখিয়া শিপ্রা বলিল, আমি সুন্দর হব শুধু তোমার জন্য, আমার অন্তর-নিংড়ানো সুখদুঃখের গরিমা বাড়্‌বে তোমারি পায়ের ধূলোর আশ্রয়ে। আর সুশান্তও শিপ্রাকে আদর করিয়া জবাব দিল, তুমি আমায় দেখিয়েছ নূতন জীবনের আলো, অনিন্দিত তোমার মাধুরী, তোমাকে সাথী পেয়ে আমি জীবনের পটভূমির সব কিছু সংশয় জয় ক'রে নিতে পারব এই আমার বিশ্বাস।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

আমরা আশা করিয়াছিলাম সুশান্ত শিপ্রার জীবন-নাট্যের রোম্যান্টিক অংশটার সমাপ্তি হইবে এইখানেই—প্রজাপতির অনুগ্রহে।

কিন্তু বিধাতা পুরুষ বাদ সাধিলেন।

শিপ্রার মা এবং সুশান্তর মামীমার মধ্যে এতদিন যে নিবিড় সখীত্ববন্ধন ছিল তাহা ছিঁড়িয়া গেল সুশান্ত-শিপ্রার অনর্থসৃষ্টিকারী কাব্যচর্চ্চার ফলে।

সুশান্তর মামীমা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই সুশান্তর সাথে শিপ্রার বিবাহে তাহার মা'র কোন আপত্তি থাকিতে পারে। সুশান্তর মত জামাই যে-কোন মেয়ের মা'র কাম্য—এই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

শিপ্রার মা'র লক্ষ্য ছিল অন্যদিকে। সুশান্তকে যে তাঁহার ভাল লাগে নাই এমন নয়, কিন্তু জামাই হিসাবে তাহাকে পাইবার জন্য তিনি আদৌ উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল আর একটি ছেলের দিকে, সে সবেমাত্র দুইটা বিলাতি ডিগ্রী এবং ব্যারিষ্টারীর ছাপ লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। শিপ্রাদের রক্তে ছিল কৌলিন্যের ধারা, তাহার উপর তাহাদের ছিল অর্থ, যাহা পৃথিবীর সব পিপাসা মিটাইবার পক্ষে সহায়তা করিতে পারে। শিপ্রার মা বিনোদিনী সংক্ষেপে তাঁহার সখীকে জানাইয়া দিলেন যে শিপ্রার বিবাহ ঠিক হইয়া আছে ব্যারিষ্টার এবং কেম্ব্রিজগ্র্যাজুয়েট সমীর রায়ের সহিত, কাজেই সুশান্তর সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা উঠিতেই পারে না।

সমীর রায়ের সহিত শিপ্রার বিবাহ যদিওবা একেবারে ঠিক ছিল না, সুশান্তর মামীমার প্রস্তাবের পর বিনোদিনী সে বিষয়ে একটু অবহিত হইলেন। সমীরকে জামাইরূপে পাইবার জন্য তিনি স্বামীর ব্যাঙ্কের খাতা তুলিয়া ধরিলেন সমীরের বাবা-মার চোখের সম্মুখে। কয়েক হাজারে রফা হইল। সমীরও কোন আপত্তি করিল না, কারণ সে বুদ্ধিমান্; দেখিল, কৃতকার্য্য ব্যারিষ্টার-রূপে বসিতে হইলে প্রথম কয়েকটা বছর অন্যের

দেওয়া অর্থের প্রয়োজন অনেকখানি বেশী। তাহা ছাড়া, যে দুই-একবার সে শিপ্রাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল তাহাতে সে বুঝিয়াছিল শ্রী এবং সৌন্দর্য্যের দিক দিয়াও শিপ্রা তাহার সহধর্ম্মিণীরূপে নিতান্ত বেমানান হইবে না।

আপনারা মনে করিবেন না সমীর-শিপ্রার বিবাহের এই সমস্ত আয়োজন চলিয়াছিল সুশান্ত বা শিপ্রার অজ্ঞাতে। মামীমার কাছে সুশান্ত যথাসময়ে জানিতে পারিল শিপ্রাকে চিরকালের প্রিয়ারূপে পাইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। ওদিকে মা'র কাছে তীব্র এক ধমক খাইয়া শিপ্রা বুঝিল যে, সুশান্তর পায়ের ধূলার আশ্রয়ে তাহার নারীত্বকে গৌরবমণ্ডিত করার সুযোগ সে পাইবে না।

সুশান্ত এবং শিপ্রা সংসারের কুটিল আবর্ত্তের সম্মুখীন হইল এই প্রথম। পরস্পরের দৈন্য, আলস্য এবং অসহায়তা বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা কি দেখিতে পাইল জানি না, তবে তাহার পর যে সব ঘটনা ঘটিল তাহাতে আমি, তাহাদের জীবনের চিত্রকর, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উঠিলাম।

সুশান্ত শিপ্রার কাছে আসিয়া বলিল, শিপ্রা, বোধ হয় শুনেছ মাসীমা তোমাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান্ না।

শিপ্রা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে শুনিয়াছে।

সুশান্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, বল ত কি করা যায়?

—কি করবে?···শিপ্রা সুশান্তর প্রশ্নের উত্তর দিল আর একটি প্রশ্নে।

সুশান্ত বুঝিতে পারিল না ইহার পর কি বলা উচিত। সে শুধু শিপ্রার হাত দুটি ধরিয়া বলিল, আশা করি সমীর রায়ের সঙ্গে বিয়েতে তুমি খুব অসুখী হবে না।···আর আমাদের এই খেলা, এটা খেলার স্মৃতিরূপেই আমাদের বুকে বেঁচে থাক্‌, একে সত্যিকারের মর্য্যাদা কখনো দিয়ো না, নইলে জীবনের প্রারম্ভে মস্ত বড় একটা ভুল করা হবে।

শিপ্রা কাঁদিল না, হাসিল না, খুব শান্ত সহজ সুরে বলিল, চেষ্টা কর্‌ব, সুশান্তদা।

আমি, তাহাদের জীবনের চিত্রকর, আশা করিয়াছিলাম বিবাহের রাত্রে বা তাহার আগের দিন শিপ্রা যাইবে সুশান্তর কাছে, সকলের অগোচরে, দেবদাসের পার্ব্বতীর মত। আমি আশা করিয়াছিলাম শিপ্রা সুশান্তর বুকে মাথা রাখিয়া বলিবে, এ জীবনে যদিও তোমাকে পেলাম না তবু আমি তপস্যা কর্‌তে থাক্‌ব আস্‌ছে জীবনে আমাদের মিলন যেন অব্যাহত হয়। আমি এমনও আশা করিয়াছিলাম, সুশান্ত হয়ত দেবদাসের মত শিপ্রার অঙ্গে এমন একটা চিরস্থায়ী দাগ রাখিয়া যাইবে যাহা তাহাকে চিরকাল মনে করাইয়া দিবে সুশান্তর প্রতি তাহার শান্ত সংযত ঔদাসীন্যের কথা। কিন্তু যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহার কিছুই ঘটিল না।

গোধূলি লগ্নে হাসি-আনন্দের কলরোলের মধ্যে সমীর-শিপ্রার বিবাহ হইয়া গেল। সুশান্ত শিপ্রার বিবাহে যোগদান করিল না, তাহাকে স্নেহ বা আশীর্ব্বাদসূচক কোন উপহারও পাঠাইল না।

ইহার পর আমি বৎসর তিনেক শিপ্রার কোন খবর রাখিতে পারি নাই। শিপ্রা চলিয়া গেল স্বামীগৃহে, আর আমি আসিলাম সুশান্তর সঙ্গে বোম্বাই-এ। সত্য কথা বলিতে কি, সমীর-শিপ্রা কি করিতেছে তাহা জানিবার কৌতূহলকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল নিঃস্ব সুশান্তর প্রতি আমার সহানুভূতি!

আমি জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্যের চিত্রকর। জীবনের চিত্রশালায় কাহারা কি ভাবে চলিতেছে, কখন তাহারা হাসিতেছে, কখন তাহারা কাঁদিতেছে, আমি যথাসম্ভব বিশ্বস্তভাবে আঁকিতে চেষ্টা করি। মানুষের অন্তরের নিবিড়তম বেদনা, তাহার দিশাহারা ব্যাকুলতা, এ সমস্ত আমার ছবির মধ্যে সাধারণতঃ ফুটিয়া ওঠে না, যতক্ষণ না তাহার একটা বহিঃপ্রকাশ হয়। শিপ্রার বিবাহের পর যে তিন বৎসর আমি সুশান্তর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম কোন দিন এমন একটা মুহূর্ত্তও দেখি নাই যেদিন সুশান্ত শিপ্রার কথা ক্ষণিকের জন্যও স্মরণ করিয়াছে। সুশান্তর অজ্ঞাতে আমি তাহার ডায়েরীর পাতা উল্টাইয়া দেখিয়াছি, দেখিতে পাইয়াছি শিপ্রা সম্পর্কে তাহার শেষ উক্তি তাহার বিবাহের তারিখে—সংক্ষেপে লেখা: আজ শিপ্রার বিয়ে হয়ে গেল।...কিন্তু তাহার পর কোন দিন সে পরোক্ষেও শিপ্রার নাম বা তাহাদের যৌবনোচ্ছল খেলার উল্লেখ করে নাই। সুশান্তর লিখিবার টেবিলে, তাহার সুটকেশে, তাহার মণিব্যাগে কোথাও শিপ্রার ছোট্ট একটি ফটোও আমি দেখিতে পাই নাই।

সুশান্তর জীবনের এই তিন বৎসরের কথা বলিতে সুরু করিয়াছিলাম! যাহা দেখিয়াছি তাহাও যেন আমার কাছে কেমন প্রহেলিকাময়, কেমন রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হয়। আমি দেখিলাম, সুশান্ত অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসিতে পারিল না, অন্ততঃ এই তিনটি বৎসর সে যেন জোর করিয়া

নিজেকে নারী-সংস্পর্শ হইতে এড়াইয়া চলিল। অথচ জীবনটাকে কেন এমন করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিল তাহার বিন্দুমাত্র আভাসও আমি তাহার কথাবার্ত্তা বা বাহিরের ভাবভঙ্গী হইতে বুঝিতে পারি নাই। সে কিছুদিন কাজ করিল একটা সংবাদপত্রের প্রেসে। রাত্রির পর রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে সে কম্পোজিং, প্রিন্টিং ও প্রুফ রিডিং-এর কাজ তত্ত্বাবধান করিত, ভোর পাঁচটার সময় স্থানীয় এজেন্টদের লোকদের হাতে কাগজগুলি দিয়া সে ছুটি লইত।···এইভাবে এক বৎসর কাটিয়াছিল। তাহার পর হঠাৎ একদিন প্রেসের স্বত্বাধিকারীর সহিত দুই-একটা কথা কাটাকাটি হওয়ায় সে এই চাকুরী ছাড়িয়া দিল। মাস তিনেক সে আর কোন কাজের সন্ধানে বাহির হইল না—এতদিন প্রেসে সে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সে তিনমাস কাটাইল অনাবিল আলস্যে, নিবিড় ঔদাসীন্যে। তিনমাস পর সে সুপ্তোত্থিতের মত ভাবিতে সুরু করিল। কি ভাবিয়াছিল তাহা জানা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, কারণ সুশান্ত স্বভাবতই স্বল্পভাষী, কিন্তু দেখিলাম সে লেখায় মন দিল। গল্প বা কবিতা লেখা নয়—গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাশীল প্রবন্ধ। কলেজে তর্কসভায় বুদ্ধিমান বক্তা বলিয়া সুশান্তর খ্যাতি ছিল, প্ল্যাটফর্ম্ হইতে নামিয়া আসিয়া লেখনী ধারণ করিয়াও তাহার সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রহিল। আমাদের দেশে গল্প লেখকরাই গল্পলেখাকে জীবিকারূপে অবলম্বন করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা করিতে পারে না, প্রবন্ধ লেখক ত কোন্ ছার। কিন্তু সুশান্তর অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি কোন স্পৃহা ছিল না। সে সামান্য যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত তাহাতেই তাহার স্বল্প ও সাধারণ অভাবগুলি মিটিয়া যাইত।

এইভাবে আরও এক বৎসর নয় মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই সুশান্তর জীবনে আমি ঘটিতে দেখি নাই।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

তাহার আড়ম্বরহীন বৈচিত্র্যবিরল জীবন পাতার পর পাতা খুলিয়া চলিল, সেখানে একটি কালির আঁচড়, এতটুকু তুলির চিহ্নও আমি দেখিতে পাইলাম না।

বিবাহের পরই শিপ্রা স্বামীগৃহে চলিয়া গিয়াছিল। সমীরের শিপ্রাকে ভালো লাগিয়াছিল, যদিও শিপ্রার চেয়েও তাহার বেশী ভালো লাগিয়াছিল তাহাকে পাইবার পাথেয়টুকু। বেশ সৌখীনভাবে অফিস্ ও ড্রয়িং রুম সাজাইয়া সমীর রায়, বার-য়্যাট্-ল, প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করিল।

শিপ্রা সমীরকে ভালোবাসিতে চেষ্টা করিল। সুশান্তর সঙ্গে তাহার কয়েক দিনের সাহচর্য্যটাকে সে বিগত জীবনের স্মৃতি বলিয়া মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু যখন আকাশে বাতাসে আলোর স্রোতে ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিত, নিজের অপরিপূর্ণ জীবনের ফাঁকের মধ্য দিয়া অননুভূতপূর্ব্ব একটা করুণ সুর বাজিয়া উঠিতে চাহিত, তখন তাহার সব এলোমেলো হইয়া যাইত। স্বামী সমীর, তাহার নূতন সাজানো সংসার, সমস্ত সে ভুলিয়া যাইত; তাহার মনে পড়িত তাহার ছিন্ন জীবনের সবচেয়ে গোপন কথাটি, যাহার বেদনার মধ্যে সে অনুভব করিত বিচিত্র একটা পুলক, যাহা শারদাকাশের মেঘের উপর ক্ষীণ রৌদ্রের রেখার মত তাহার অন্তরাকাশের শুভ্রতাকে করিয়া তুলিত আরও গৌরবোজ্জ্বল, আরও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন।

সমীর শিপ্রার মনের বিচিত্র লীলা বিশেষ বুঝিতে পারিত না, সেদিকে তাহার নজরও ছিল না। স্বামীর যাহা কিছু দাবী শিপ্রা সমস্তই মিটাইতে

যথাসাধ্য চেষ্টা করিত, তাহা ছাড়া সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য যাহা দরকার তাহাও সমীর পূরামাত্রায় পাইত। কাজেই মাসের মধ্যে একটি দিন যদি শিপ্রা অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকিত, স্বামীর চায়ের টেবিলে আসিয়া বসার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিত, সমীর তাহাতে ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ণ হইত না। এরকম ত্রুটি জীবনযাত্রার অপরিহার্য্য একটা অঙ্গ, একটা বৈচিত্র্যদায়ক পরিবর্ত্তন মনে করিয়া সে বরং খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত।

এইভাবে শিপ্রা-সমীরের জীবন একটানা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছিল। সচরাচর যেমন দেখা যায় তাহার চেয়ে বেশী একটু নিবিড়তা, পরস্পরের জন্য বেশী একটু ঔৎসুক্যই বাহিরের লোকে তাহাদের মধ্যে লক্ষ্য করিত এবং আদর্শ দম্পতি হিসাবে তাহাদের দৃষ্টান্তের উল্লেখও করা হইত। কিন্তু যাহারাই শিপ্রার অন্তরের আবরণটি খুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহারাই বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে তাহা বেদনায় লাল এবং সেখানে রহিয়াছে সুতীব্র একটা কঠিনতা যাহার সংস্পর্শে কোমল এবং কমনীয় সব কিছুই প্রতিহত হইয়া আসে।

শিপ্রার অন্তরের ক্ষত কোন দিন সারিত কি না জানি না, কিন্তু আমাদের বিধাতাপুরুষ আসিয়া আবার এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিলেন। দুই বৎসর সমীরের গৃহলক্ষ্মীভাবে থাকার পর নিঃসন্তানা শিপ্রা বিধবা হইল।

সমীরের সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে বিবাহে শিপ্রা বিহ্বল হয় নাই, কিন্তু তাহার মৃত্যুতে সে সত্যই বিহ্বল হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে শিপ্রার বাবা-মা দুইজনেই মারা গিয়াছিলেন, কাজেই সংসারে দাঁড়াইবার মত কোন আশ্রয়ই তাহার ছিল না। সমীর অবশ্য কোন ঋণ রাখিয়া যায় নাই, কিন্তু তাহার সঞ্চয়ও বিশেষ কিছু ছিল না। শিপ্রা দেখিল তাহার সম্মুখে পড়িয়া

রহিয়াছে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—তাহাকে বাঁচিতে হইবে এবং ভালোভাবে বাঁচিতে হইবে।

সুশান্তর কথা তাহার মনে হইয়াছিল। বিগত জীবনের সৌরভের মত ভাসিয়া আসিয়াছিল সুশান্তর কানে-কানে কথা বলা, তাহার সলজ্জ সম্ভাষণ। কিন্তু সুশান্ত কোথায়, কী ভাবে আছে তাহা যে সে কিছুই জানে না। কাজেই সে সাময়িকভাবে সুশান্তর চিন্তা মন হইতে বিসর্জ্জন দিল।

একটি বৎসর কাটিল নানা বিশৃঙ্খলায়। জীবনের ভবিষ্যৎ পথ স্থির করিয়া লইতে গিয়া সে অনেকবার ভুল করিল, স্পর্দ্ধা করিয়া সে অনেক কিছুতে হাত দিল, আবার কিছুদিন পরেই সে মলিন মুখে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। অবশেষে একটি মেয়ে-প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সে একটি বৃত্তি পাইল—বিলাতে গিয়া শিক্ষা-সম্পর্কীয় একটা ডিপ্লোমা লইয়া আসিবার জন্য। শিক্ষাক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ জীবনটা কাটাইয়া দিবে সে স্থির করিয়া ফেলিল।

আমাদের গল্পের শেষাঙ্কে আসিয়া পৌঁছিলাম।

শিপ্রা বোম্বাই-এ আসিল, পরের দিন তাহার ইউরোপগামী জাহাজ ছাড়িবে। বোম্বাই শহরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে এস্‌প্ল্যানেড্‌-এর মোড়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল।

সুশান্তও কি যেন একটা কাজে সেখান দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার নজর পড়িল শিপ্রার দিকে। ঠিক সেই তিন বছর আগেকার শিপ্রার মত, তবে যেন একটু রোগা হইয়া গিয়াছে।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

সুশান্ত ভাবিতে লাগিল শিপ্রাকে সম্ভাষণ করিবে কি-না। যদি সমীর কাছাকাছি কোথাও গিয়া থাকে তবে হয়ত শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে এবং তখন শিপ্রা হয়ত রীতিমত বিব্রত বোধ করিবে।

সে খানিকক্ষণ শিপ্রার দিকে তাকাইয়া রহিল। পর্য্যবেক্ষণের পর তাহার মনে হইল, শিপ্রা একা। সে অগ্রসর হইয়া গেল।

শিপ্রা তাকাইয়া চিনিতে পারিল। সুদীর্ঘ তিন বৎসর পর সুশান্তর সহিত তাহার দেখা, তাহার চোখের সম্মুখে দিনের আলোগুলি যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার হঠাৎ নিভিয়া গেল।

শিপ্রাই প্রথমে কথা বলিল, সুশান্তদা!

—হ্যাঁ, আমি। তা তুমি এখানে কোত্থেকে? তোমার স্বামী, মিঃ রায়, কোথায়?

শিপ্রা মলিনভাবে হাসিল। নিজের সীমন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, উনি বছর খানেক হ'ল মারা গেছেন। আমি একা··· বিলেত চলেছি।

সংবাদের আকস্মিকতা সুশান্তকে ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার পর একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, তোমার বাবা-মা?···তোমার—তোমার ছেলেমেয়ে?

আগেরই মত হাসিয়া শিপ্রা জবাব দিল, বাবা-মা ওঁর আগেই চলে গেছেন। আর, ছেলেমেয়ে? আমি ত আগেই বলেছি সুশান্তদা, আমি একা।

—তুমি কবে বিলেত যাচ্ছ? কেন? কতদিন থাক্‌বে?···এক নিঃশ্বাসে সুশান্ত এতগুলি প্রশ্ন করিয়া বসিল।

—বিলেত যাচ্ছি কাল, ভিক্টোরিয়া জাহাজে। বৃত্তি পেয়েছি, একটা শিক্ষা-ডিপ্লোমা নিয়ে আস্‌ব। বছর দুই থাক্‌তে হবে।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

সূচীভেদ্য একটা অন্ধকার যেন সুশান্তকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছিল। সে বলিল, তোমার হাতে ত সময় আছে শিপ্রা, আমার দুটো কথা বল্‌বার ছিল, আমার সঙ্গে একটু আস্‌বে ?

শিপ্রা মুহূর্ত্তের জন্য কি ভাবিল। তারপর বলিল, চলো…

উভয়ে হাঁটিয়া চলিল সমুদ্রের ধারে, বড় বড় ডকগুলি যেখানে শেষ হইয়া গিয়াছে। একটা খোলা জায়গা দেখিয়া উভয়ে বসিল।

সুশান্তই কথা সুরু করিল।

—তুমি বিলেত যাচ্ছ, বাকী জীবনটা কি তুমি শিক্ষয়িত্রী-ভাবেই কাটিয়ে দিতে চাও, শিপ্রা ?

একটু যেন তিরস্কারের সুরে শিপ্রা বলিল, তা ছাড়া আর কোন পথ আমার খোলা আছে কি, সুশান্তদা ? বিধবা মেয়ের স্থান আমাদের দেশে এখনও অতি অগৌরবের। এরই মধ্যে চলনসই একটা ব্যবস্থা আমাকে ত করে নিতেই হবে, নয় কি ?

লজ্জিত সুরে সুশান্ত বলিল, সে কথা আমি অস্বীকার করছি না, শিপ্রা…কিন্তু ভাবছিলাম, আর কি কোন পথই তোমার খোলা নেই ?

—দেখ্‌ছি না ত !

সুশান্ত যেন একটু ভরসা পাইল। আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, বিগত জীবনের স্মৃতি আমি জোর ক'রে তোমায় মনে করিয়ে দিতে চাই নে শিপ্রা, কিন্তু আমায় বিশ্বাস ক'রো, এই তিনটি বছর আমি কাটিয়েছি আলো-নেবানো উৎসব-প্রাঙ্গণে ভীরু প্রহরীর মত। নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছি কাজে অকাজে, বাইরে কাউকে এমন কি আমার নিজের মস্তিষ্ককেও জান্‌তে দিইনি আমার অন্তরের কথা।…তিন বছর আগে সাহস সঞ্চয় ক'রে যে ন্যায়সঙ্গত দাবী জানাতে পারিনি, আজ সেটা ভিক্ষার মত তোমায় জানাচ্ছি।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

—আমাকে কী করতে ব'লো ?...খুব সহজভাবেই শিপ্রা প্রশ্ন করিল।

—বিধবাবিবাহে আমার কোন আপত্তি নেই, শিপ্রা।...কম্পিতকণ্ঠে সুশান্ত বলিল।

—কিন্তু আমার আছে।...সুদৃঢ় স্বরে শিপ্রা জবাব দিল।

সুশান্ত এতক্ষণ যে কল্পনা-সৌধ রচনা করিয়া তুলিতেছিল, শিপ্রার এই সংক্ষিপ্ত জবাবে তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সে বেদনাপাণ্ডুর মুখে বসিয়া রহিল।

শিপ্রা কথা বলিল, খুব ধীরে ধীরে, খুব সংযত সুরে :

—এমন একটা দিন ছিল, সুশান্তদা, যেদিন তোমার কাছ থেকে এই রকম একটা দাবীরই প্রতীক্ষা করেছিলাম। সেদিন আমি ছিলাম নিতান্ত অসহায়া, সংসারে নির্ম্মমতায় অনভ্যস্তা কিশোরী। সেদিন যদি তুমি এতটুকুও জোর গলায় আমাকে বলতে যে আমাকে তোমার চাইই, তা হ'লে আমিও অনেকখানি জোর পেতাম; তোমার সঙ্গে সমান ওজনে গলা মিলিয়ে আমিও বল্‌তে পারতাম, সুশান্তকে আমার চাইই।...তুমি তোমার দাবী জানালে না, উপেক্ষিত ব্যাহত শিপ্রা আশ্রয় খুঁজল যে তাকে আশ্রয় দিতে চাইল তারই বুকে। কিন্তু সেখানেও সে শান্তি পেল না। সুদীর্ঘ দুই বৎসরের বিবাহিত জীবন সে কাটাল অভিনয় ক'রে—মনের গভীরতম প্রদেশে তার স্বামীর রইল প্রবেশ নিষেধ, সেখানে শুধু খেলা করতে লাগল শিপ্রা আর তার কিশোরী জীবনের প্রিয়।...তুমি জান আমি সন্তানহীনা, এটাকে আমি বিধাতার বিধান বল্‌ব না, এটা যে হ'তে বাধ্য ছিল। আমি স্বামীর কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দিতে ত কখনও পারিনি! এই অসম্পূর্ণ মিলনের ফলে সন্তান কি কখনও আস্‌তে পারে, সুশান্তদা ?...যাক্‌ সে কথা। দু'বছর

পর যখন আমি সংসারে এসে দাঁড়ালাম সম্পূর্ণ একা, তখন প্রথমটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। সংসারের আঘাতের সম্মুখীন এরকম ক'রে ত আর কখনও হইনি! কিন্তু এই একটী বছরের মধ্যে আমার নিজেকে আমি ফিরে পেয়েছি, সুশান্তদা···আমার মনে হয় না আর কখনও আশ্রয়ের জন্য আমাকে লালায়িত হ'তে হবে।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়া শিপ্রা হাঁফাইতে আরম্ভ করিল।

সুশান্ত চুপ করিয়া শিপ্রার কথাগুলি শুনিল, তাহার পর গভীর শ্রদ্ধায় তাহার ডানহাতখানি শিপ্রার হাতের উপর রাখিল। শিপ্রা কোন বাধা দিল না।···সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছল হইয়া উঠিল, ঝির ঝির করিয়া একটা বাতাস তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া দিয়া গেল, দূরে একটা বন্দর-প্রত্যাগত জাহাজের বাঁশীর শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

সুশান্ত ধীরে ধীরে বলিল, বেশ রাত হয়ে যাচ্ছে শিপ্রা, চলো।

যেন অশ্রুতবাণী শুনিতেছে এইভাবে অন্যমনস্ক শিপ্রা জবাব দিল, চলো।

পরের দিন শিপ্রা যখন ভিক্টোরিয়া জাহাজে ওঠে তখন জেটিতে সে অনেকবার একখানা পরিচিত মুখের সন্ধান করিয়াছিল, সন্ধান মিলে নাই।

আমি, সুশান্তর জীবনকার, জানি সে কোথায় ছিল। সে গিয়াছিল তাহার সেই ভূতপূর্ব্ব সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর কাছে। তাহার নিজেরই অপরাধ হইয়াছে স্বীকার করিয়া সে আবার প্রেস-ম্যানেজারের কাজে বহাল হইল।

সুশান্ত আগের মত রাতের পর রাত আবার সেই প্রেসে কাজ করিতেছে।

পুরানো চিঠি

সন্ধ্যার একটু আগে ব্যারিষ্টার সতীশ নন্দী প্রকাণ্ড একটা চুরুট ফুঁকিতে ফুঁকিতে বেশ খুশী মেজাজে তাঁহার লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিলেন। সাধারণতঃ এই সময়টায় তিনি কোন কাজ করেন না, কিন্তু হাইকোর্টের প্রতিপক্ষের প্রবীণ ব্যারিষ্টারকে আইনের একটা কূটতর্কে হারাইয়া দিয়া তিনি বেশ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম বোধ করিতেছিলেন, তাই ভাবিলেন আইন বার্ষিকীর পুরানো সেটগুলি আরেকবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবেন তাঁহার নজিরগুলি সত্যই প্রাসঙ্গিক হইয়াছে কি না।

অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, সুইচ্‌টা টিপিয়া বইএর আলমারীর দিকে অগ্রসর হইতেই তিনি দেখিলেন তাঁহার অত্যন্ত আদরের নাতি পাঁচ বৎসরের নীতীশ তাঁহার মূল্যবান্ নথিপত্র টেবিল হইতে মেঝেতে নামাইয়া তাহার উপর পেন্সিলের আঁচড় কাটিতেছে। নীতীশ দাদামহাশয়কে দেখিয়াই পলায়নপন্থা অবলম্বন করিতেছিল, মিঃ নন্দী তাহার গতিরোধ করিয়া গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন, এসব কী হচ্ছিল ?

পুরানো চিঠি

সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর দিতে নীতীশ খুব পটু। জবাব দিল, দলিল লিখ্‌ছিলাম।

নীতীশ মিঃ নন্দীর একমাত্র মেয়ে প্রতিমার একমাত্র ছেলে। তাহার আসন যে সাধারণের অনেক উঁচুতে তাহা সে বেশ ভালভাবেই জানে।··· দাদামহাশয়ের কেরাণী যে সব দলিলপত্র লেখে তাহার দিকে তাহার নজর অনেক দিন হইতেই আছে, আজ সুযোগ পাইয়া নিজেকে দাদামহাশয়ের দ্বিতীয় সহকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, হঠাৎ রসভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় সে মোটেই খুশী হয় নাই।

মিঃ নন্দী নীতীশকে আদর করিয়া বলিলেন, বুঝেছি, খুব লিখ্‌তে শিখেছ। কিন্তু দাদুর কাছে লিখ্‌বার সাদা কাগজ চাইলেই ত পারো··· নূতন দলিল লিখে দিতে পারবে।

বলিয়া নীতীশের পিঠ চাপড়াইয়া তাহার হাতে এক টুকরা শাদা কাগজ এবং একটা লালনীল পেন্সিল দিয়া মিঃ নন্দী তাহাকে সাময়িকভাবে লাইব্রেরী হইতে বিদায় করিয়া দিলেন।

আইন বার্ষিকীর পুরানো সেটগুলির মধ্যে যে এত মূল্যবান তথ্য আছে মিঃ নন্দী শান্তভাবে কখনও তলাইয়া দেখেন নাই। বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রখরতার জোরেই তিনি ব্যবসায়ে মাঝারিরকমের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, অধ্যবসায় দ্বারা সাফল্যের উচ্চশিখরে ওঠার প্রয়াস ছিল তাঁহার স্বভাব বহির্ভূত। তাই আজ যখন একটির পর একটি আইন-রিপোর্টের বই খুলিয়া পড়িতে সুরু করিলেন তখন কিছুক্ষণের জন্য তিনি বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত হইয়া পড়িলেন।

স্বল্প ব্যবহারে বইগুলি ধূলি আবৃত হইয়া গিয়াছিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মিঃ নন্দী সযত্নে সেগুলি ঝাড়িতে সুরু করিলেন।

১৯১৫ সালের একখানা মোটা বই অন্যমনস্কভাবে ঝাড়িতেছিলেন। এমন সময় টুক্ করিয়া একটি নীলাভ খাম মাটিতে পড়িল। বিস্মিত হইয়া মিঃ নন্দী সেটি তুলিয়া লইলেন।

দেখিলেন, তাঁহারই হাতে লেখা ঠিকানা সেই খামটির উপরে, চব্বিশ বৎসর আগেকার লেখা, যখন তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল একটা গৌরব করার বস্তু।

সুন্দর পরিষ্কার অক্ষরে ঠিকানা লেখা রহিয়াছে :

"শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী,
৬৫, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

চব্বিশ বৎসর আগে চিঠিখানা ঠিক যেভাবে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই ভাবেই বন্ধ রহিয়াছে। পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিকৃতিবাহী দুই পয়সার ডাকটিকিটটি পর্য্যন্ত অক্ষতভাবে বিরাজমান্!

মুহূর্ত্তের জন্য মিঃ নন্দী অনুভব করিলেন, পৃথিবীটা যেন তাঁহার পায়ের নীচ হইতে অপসৃত হইয়া যাইতেছে। দৃঢ় নিয়ন্ত্রিত নিয়মে বাঁধা জীবনের আবরণটা যেন আকস্মিক এক আঘাতে খসিয়া পড়িল।

কম্পমান্ বক্ষে সসঙ্কোচে মিঃ নন্দী খামটা ছিঁড়িলেন। যেন চুরি করিতেছেন, নিজের লেখা চিঠি পড়িবার যেন তাঁহার কোনই অধিকার নাই।

পুরানো চিঠি

চিঠিখানা লেখা হইয়াছিল পাটনায়, মিঃ নন্দী তখন সেখানে কলেজে পড়িতেন। সহজ স্বাভাবিক চিঠি :

"মৈত্রেয়ী,

তোমার সঙ্গে শীগ্‌গীর আর দেখা হবে কি না জানিনা, আজ লিখ্‌ছি তোমাকে শুধু এইটুকু জানাতে যে তোমাকে আমার বড় ভালো লেগেছে। আমি মার কাছে তোমার কথা বল্‌তে চাই, কিন্তু তার আগে তোমার সম্মতি দরকার। তুমি কোন রকম সঙ্কোচ বা দ্বিধা না করে তোমার মতামত লিখে জানিয়ো। আমি সেই অনুযায়ী কাজ কর্‌ব।

সতীশ।"

চিঠির উপর ডাকটিকিট লাগাইয়াও ডাকবাক্সে ফেলা হয় নাই, তাঁহার ইচ্ছাকৃত অবহেলা ইহার জন্য দায়ী নহে। যতদূর স্মরণ করিতে পারিলেন, চিঠিখানা তিনি যথাস্থানে পাঠাইবার জন্য চাকর ভুলুয়ার হাতে দিয়াছিলেন, সেই বোধ হয় ভুল করিয়া বাক্সে ফেলে নাই। অথচ সপ্তাহ খানেক পরেও যখন কোন জবাব পাইলেন না তখন তিনি ভুলুয়াকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, চিঠি পোষ্ট করা হইয়াছে কিনা, এবং সে জবাব দিয়াছিল, হ্যাঁ, সে বাবুর নির্দ্দেশমত নিজে পোষ্টাফিসে যাইয়া চিঠিটা বাক্সে ফেলিয়া আসিয়াছে!

মিঃ নন্দীর মনের চিন্তাধারাগুলি কেমন যেন এলোমেলো হইয়া আসিল। মৈত্রেয়ী—অশোক বসুর মেয়ে মৈত্রেয়ী—যাহাকে তিনি স্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, সে তাঁহাকে তাহা হইলে উপেক্ষা

করে নাই! হয়ত সে কতদিন কত সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার চিঠির প্রতীক্ষা করিয়াছে এবং অবশেষে যখন কোনই সংবাদ পায় নাই তখন ভাবিতে বাধ্য হইয়াছে যে সতীশ তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। অথচ এদিকে অসহায় সতীশ নন্দী দুর্ভাবনায় অনিশ্চয়তায় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিকারের কোনই পথ খুঁজিয়া পান নাই।

চলচ্চিত্রের ছবির মত বাকী কয়েকটা বৎসরের কাহিনী মিঃ নন্দীর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল।...তখন তিনি এম্‌-এ পড়িতেছেন, মৈত্রেয়ীকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশের পর বৎসর খানেক গত হইয়াছে। কলিয়ারী ম্যানেজার সুদর্শন দত্ত তাঁহার কন্যা নলিনীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লোভ দেখাইলেন জামাইকে তিনি বিলাত পাঠাইবেন, ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্য। বিলাত যাইবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সতীশ নন্দী রাজী হইলেন।

তাহার পর গতানুগতিকভাবে নলিনীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সতীশ নন্দী একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু বিবাহ পর্ব্ব যখন শেষ হইয়া গেল তখন সাধারণ অন্যান্য যুবকদের মত পত্নীব্রত হইতে তাঁহার এতটুকু দেরী হইল না। তাহা ছাড়া পিতৃগৃহ হইতে নলিনী শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিল যে বিলাতগামী স্বামীকে স্ববশে রাখিতে হইলে নিজেকে বেশ একটু আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। এই শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগে তাহার নৈপুণ্য অচিরেই পরিস্ফুট হইল।

সতীশ নন্দীর বিলাত প্রবাসকালে তাঁহার প্রথম সন্তান একমাত্র মেয়ে প্রতিমার জন্ম হয়। ইহার ছয় বৎসর পর তাঁহার একমাত্র ছেলে পরেশের জন্ম। পরেশ এখন কলেজে পড়ে। প্রতিমার অপেক্ষাকৃত

পুরানো চিঠি

অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, তাহার ছেলে নীতীশ মিঃ নন্দীর অত্যন্ত আদরের।

মিসেস্ নন্দী—নলিনী—এখন আর তন্বী বধূ নহে। বাইশ তেইশ বৎসরে দৈহিক এবং মানসিক অনেক পরিবর্ত্তনই তাহার ঘটিয়াছে। মেদমজ্জার অংশ বাড়িয়াছে, গলার স্বর আগের চেয়ে গম্ভীর হইয়াছে, গৃহের এবং গৃহের অধিবাসীদের উপর অখণ্ড আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিঃ নন্দী অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, তাহা ছাড়া স্ত্রীর বিশাল দেহের সম্মুখীন হইলে তিনি স্বভাবতঃই একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন, নিরীহ সরীসৃপের মত সমস্ত অধিকার স্ত্রীর হাতে সঁপিয়া দিয়া তিনি অবশেষে তাঁহার স্থান খুঁজিয়া নিয়াছিলেন তাঁহার এই লাইব্রেরী ঘরটির মধ্যে। এখানে বসিলে তিনি বাইরের সব কিছু ঝড় ঝাপটার হাত হইতে মুক্তি পান্, এখানে তাঁহার সাথী থাকে তাঁহার দামী বাঁধানো মোটা বইগুলি, তাঁহার মক্কেল সম্প্রদায় এবং অধুনা তাঁহার নাতি নীতীশ।

আলো চোখে লাগিতেছিল, মিঃ নন্দী উঠিয়া আলোটা নিভাইয়া দিলেন। তাহার পর স্তব্ধভাবে নীল খামখানা হাতে নিয়া বসিয়া রহিলেন।

ইহাকেই বলে ভবিতব্য! যদি চব্বিশ বৎসর আগে তিনি তাঁহার অলসতা বর্জ্জন করিয়া নিজে চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলিতেন তবে আজ তাঁহার জীবন হয়ত সম্পূর্ণ অন্যপথে চলিয়া যাইত! হয়ত আদালতের ছায়া কোনদিন তাঁহাকে মাড়াইতে হইত না, হয়ত তিনি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রবীণ অধ্যাপকরূপে কত সুনাম অর্জ্জন করিতেন। আর তাঁহার পারিবারিক জীবনে হয়ত (হয়ত কেন, নিশ্চয়ই) প্রতিফলিত হইত সম্পূর্ণ নূতন এক রূপ, রং, আশা।…চব্বিশ বৎসর পর তরুণী মৈত্রেয়ীর হাতের স্পর্শ মিঃ নন্দী যেন পুনরায় অনুভব করিলেন।

তাঁহার দিবাস্বপ্ন রূঢ়ভাবে ভাঙ্গিয়া দিল তাঁহার স্ত্রী নলিনী। দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, ভেতরে আসতে পারি ?

—এসো।…অত্যন্ত ক্লান্তস্বরে মিঃ নন্দী বলিলেন এবং শশব্যস্তে চিঠিখানার উপর একখানা বই চাপা দিলেন।

ঘরে ঢুকিয়া সন্দিগ্ধভাবে নলিনী প্রশ্ন করিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপটি করে কী ভাবছিলে ? আজ বুঝি কেস্-এ হেরে এসেছ ?

মিঃ নন্দী হাসিলেন। হায় নলিনী, তুমি মানুষের সুখদুঃখ, একাগ্রতা ঔদাসীন্য বিচার ক'রো ব্যবহারিক সাফল্যে এবং টাকাপয়সার মাপকাঠিতে ! কী করিয়া তুমি বুঝিবে ছোটখাট এই সব দ্বঃখদ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধেও মানুষ উঠিতে পারে, উদাসী গৃহবিরাগী মন কখনও কখনও বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যাইয়া রৌদ্রভরা নীল নির্জ্জন অতীতের কোলে সান্ত্বনা খুঁজিতে যায় !

শুধু বলিলেন, না, হারিনি। বরং জিতে এসেছি।

নলিনী বিশ্বাস করিল না।

একটু পরে প্রশ্ন করিল, কার চিঠি পড়্ছিলে ?

যাকে বলে শ্যেনদৃষ্টি—এতটুকু কাগজও চোখ এড়ায় না ! মিঃ নন্দী বলিলেন, ও কিছু নয়। এক মক্কেলের চিঠি।

—হুঁ।…তা' বাতি জাল্‌ছ না কেন ?

—এই ত বেশ আছি।

পুরানো চিঠি

—আমি বাতিটা জ্বেলে দিচ্ছি।···বলিয়া অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই নলিনী স্নইচটা টিপিয়া দিল। হঠাৎ রূঢ় আলো চোখে আসিয়া পড়ায় মিঃ নন্দী চক্ষু মুদিলেন।

—মক্কেল বুঝি ধন্যবাদ জানিয়েছে?

—না, তার কেস্ সম্পর্কে কতকগুলো নতুন পয়েন্ট লিখেছে।

নলিনী বুঝিল স্বামী তাহাকে বিশেষ কিছু বলিতে চাহেন না। সে জানে এইখানে তাহার ক্ষমতা প্রতিহত—স্বামীর দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্য সে কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারিবে না। সে চিঠি সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন করিল না।

—নীতীশ কোথায়?···সে শুধু বলিল।

—নীতীশ? এই ত একটু আগেও এখানে ছিল, তোমার ঘরেই বোধ হয় গেছে।

নলিনী উঠিল। চলিয়া যাইবার সময় বলিল, আজ মিঃ বিশ্বাসদের ওখানে ডিনার রয়েছে, ভুলে যেয়ো না যেন, সময় মত ড্রেস্ করতে এসো।

নলিনী ঘর হইতে বাহির হইবামাত্র মিঃ নন্দী চিঠিটা টেবিল হইতে তুলিয়া সযত্নে তাঁহার ড্রয়ারে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

পরের দিনটা মিঃ নন্দী অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে কাটাইলেন। এক বহু পুরাতন মক্কেল একটা কেস্ নিয়া আসিয়াছিল, মিঃ নন্দী কিছুতেই মন দিতে পারিতেছিলেন না। খানিকটা শুনিয়া শ্রান্তভাবে বলিলেন, আজ থাক রসিক বাবু, শরীরটা ভালো লাগ্ছে না।

বার লাইব্রেরীতেও তিনি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে অন্যান্য দিনের মত মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার সমসাময়িকেরা উপদেশ দিল, নন্দী, তুমি ভয়ানক খাট্‌ছ, কিছুদিন বিশ্রাম নাও। একবার কাশ্মীর ঘুরে এসো।···জুনিয়ারেরা আড়ালে যাইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, বুড়ো নন্দী নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছে।

পৃথিবীটার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মিঃ নন্দী সে দিন গৃহে ফিরিলেন। কেন এমন হয়? মানুষ ঐকান্তিকভাবে যাহা চায় তাহা সে পায় না কেন?

মিঃ নন্দী হঠাৎ স্থির করিয়া বসিলেন, মৈত্রেয়ীর খোঁজ করিবেন।

বিশাল কলিকাতা সহরে চব্বিশ বৎসর আগেকার পরিচিত লোককে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু মিঃ নন্দী প্রবীণ ব্যারিষ্টার, ফন্দী ফিকির সবই তাঁহার জানা আছে, দিন সাতেকের মধ্যেই তিনি মোটামুটি খবর বাহির করিয়া ফেলিলেন।

মৈত্রেয়ীর বিবাহ হইয়াছিল এক মুন্সেফের সঙ্গে, ভদ্রলোক এখন বর্দ্ধমানে সহকারী জজ। বিশাল সংসার তাহাদের—চার ছেলে এবং তিন মেয়ের মা সে। মেয়েদের কল্যাণে নাতি নাত্‌নীও আছে অন্ততঃ চার পাঁচটি।

মিঃ নন্দী একটু দমিয়া গেলেন। এতদিন পর্য্যন্ত মৈত্রেয়ীকে তিনি কল্পনা করিতেছিলেন শুধু আরেকজনের গৃহলক্ষ্মীরূপে—মাতা এবং মাতামহী মৈত্রেয়ীর সম্মুখীন হইতে তিনি বিশেষ ভরসা পাইতেছিলেন না।

অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন নিজের কোন পরিচয় না দিয়াই তিনি একবার মৈত্রেয়ীর স্বামী-গৃহে উপস্থিত হইবেন এবং একবার মৈত্রেয়ীকে দেখিবার সুযোগ খুঁজিবেন। তিনি নিজে ব্যারিষ্টার, বর্দ্ধমানের সহকারী

পুরানো চিঠি

জজের আদালতে একটা কেস্-এ অবতীর্ণ হওয়ার বন্দোবস্ত করাটা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কঠিন হইল না।

কেস্টা সেদিন বেশ জমিয়াছিল। সুনিপুণভাবে মিঃ নন্দী যখন তাঁহার মক্কেলকে জিতাইয়া দিলেন তখন জজ সাহেব মিঃ বসু পর্য্যন্ত বেঞ্চ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইলেন।

কোর্টের পর বিকালবেলা মিঃ নন্দী গেলেন মিঃ বসুর বাংলোতে। দেখিলেন অসংখ্য ছেলেমেয়ে পরিবৃত হইয়া জজসাহেব বারান্দায় বসিয়া চা খাইতেছেন। মিঃ বসু মিঃ নন্দীকে সাদরে আহ্বান করিলেন।

—আমি আজই কল্‌কাতায় ফিরে যাচ্ছি, যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলুম, আপনি আজ যে ধীরভাবে আমার নজিরগুলো শুনেছেন সেজন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

অমায়িক মিঃ বসু বলিলেন, বিলক্ষণ!···কল্‌কাতা থেকে আপনারা মাঝে মাঝে আমাদের পাড়াগাঁয়ে এলে আমাদের বিচারক্ষমতাও যে অনেকখানি বেড়ে যায়। এখানকার বার কি আইনের কিছু বোঝে? আপনাদের সংস্পর্শে এসে এদের চোখ অনেকখানি খুলে যায়, নিজেদের গলদ কোথায় তা' উপলব্ধি কর্‌তে পারে।

আইন, স্থানীয় বারলাইব্রেরী, হাইকোর্টের নূতনতম কায়দাকানুন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সরকারের অদূরদর্শিতা ও পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে মিঃ নন্দী হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসু চোখ খুঁজিতেছিল বসুজায়াকে।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

—এরা বুঝি আপনার ছেলেমেয়ে ?···মিঃ নন্দী প্রশ্ন করিলেন।

—ছেলেমেয়ে নাতিনাত্‌নী দুই-ই মেশানো আছে।···এই দুটি হচ্ছে আমার বড়মেয়ে অমিতার ছেলে, এটি হচ্ছে আমার মেজমেয়ে প্রীতির মেয়ে, আর এটি হচ্ছে আমার নিজের ছেলে—সর্ব্বকনিষ্ঠ।

বেশ খানিকটা গর্ব্ব ও আত্মপ্রসাদ লক্ষিত হইল তাঁহার কথায়।

মিঃ নন্দী ভাবিতেছিলেন কীভাবে বসুজায়ার কথা উল্লেখ করিবেন।

বলিলেন, আপনি যদি কখনও কল্‌কাতায় যান্‌ আমার বাড়ীতে একবার পায়ের ধূলো দেবেন। মিসেস্‌ নন্দীও খুব খুশী হবেন।

মিসেস্‌ নন্দীর উল্লেখে জজসাহেবের চেতনা হইল। শশব্যস্তে বলিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবো, নিশ্চয়ই যাবো, অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, মিসেস্‌ বসুর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি'···উনি অবশ্যি খুব বেশী বেরোন না, ছেলেমেয়ে নাতিনাত্‌নীদের নিয়েই ব্যস্ত থাকেন।

চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, মাকে একবার খবর দে ত !

মিনিট পনর পরে গজেন্দ্রগতিতে মিসেস্‌ মৈত্রেয়ী বসু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখে বেশ একটুখানি বিরক্তির ছায়া। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সম্পূর্ণ একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্মুখে তাঁহাকে আসিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে ইহাই তাঁহার বিরক্তির প্রধান কারণ।

মিঃ নন্দী প্রথমে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। এই সেই মৈত্রেয়ী ? তাহার সেই তন্বী কমনীয় দেহ, শান্তশ্যামল চোখের স্নেহ অভ্যর্থনা, যাহা তাঁহাকে চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে পুলকচঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল ? স্থূলাঙ্গিনী মেদবহুল মুখে কোটরগতচক্ষু মাতামহী মৈত্রেয়ীর সঙ্গে তাঁহার প্রিয় মৈত্রেয়ীর এতটুকু সাদৃশ্যও যে নাই !

পুরানো চিঠি

মিসেস্ বসু মিঃ নন্দীকে চিনিতে পারিলেন কিনা বোঝা গেল না, ভালো করিয়া একবার তাঁহার দিকে তাকাইলেনও না। স্বামীকে বলিলেন, আমি এখন বড্ড ব্যস্ত আছি, কেন ডেকেছ ?

মিঃ বসু তাঁহার অতিথিকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনি কল্‌কাতা থেকে এসেছেন, আমার কোর্টে একটা কেস্ ছিল, সেই উপলক্ষেই এসেছিলেন, আমাদের নেমন্তন্ন করে গেলেন কল্‌কাতায় এঁর ওখানে যেতে।

নিতান্ত নিরাগ্রহভাবে বসুজায়া বলিলেন, সে বেশ ত, যাওয়া যাবে, কিন্তু আমি এখন একটুও দাঁড়াতে পার্‌ছিনা। অমির খোকাটা কাঁদ্‌ছে, অমি বাইরে বেরিয়েছে, আমি চল্‌লুম।

অমি মানে তাহার বড়মেয়ে অমিতা।

যে ভাবে আসিয়াছিলেন সেই ভাবেই বসুজায়া চলিয়া গেলেন।

একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া মিঃ বসু বলিলেন, ওঁকে দোষও দেওয়া যায় না, চারিদিক থেকে এত উৎপাত উপদ্রব লেগে রয়েছে যে একটি মিনিটও শান্তভাবে বসবার অবসর পান না।···সংসারধর্ম্ম পালন করা রীতিমত শ্রান্তিকর, মিঃ নন্দী।

মিঃ নন্দী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন এবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ একমত।

জজসাহেবের বাংলোর হাওয়া তাঁহার কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর বলিয়া বোধ হইতেছিল। তিনি আর দেরি না করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ডাকবাংলোয় আসিয়াই তিনি ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন গাড়ী তৈরী করিতে—অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

কলিকাতায় নিজের বাড়ীতে যখন পৌছিলেন তখন রাত আটটা বাজিয়া গিয়াছে। নলিনী সাজিয়া গুজিয়া কোথায় যাইবার জন্য তৈরী হইতেছে। স্বামীকে এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, ওকি, তুমি আজই ফিরে এলে ?

—হ্যাঁ, কাজ শেষ হয়ে গেল, শুধু শুধু ম্যালেরিয়ার মশার কামড় খেতে ইচ্ছা হ'ল না।

—সে বেশ করেছ, আজকাল তুমি বাড়ীতে থাকতেই চাও না, তবু যে ম্যালেরিয়ার ভয়ে পালিয়ে এসেছ আমাদের লাভ। তোমার খাবার তৈরী করতে বলি।...নলিনী বেশ খুশী মেজাজেই কথাগুলি বলিল।

—হ্যাঁ, বলো।...বলিয়া মিঃ নন্দী তাঁহার লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিলেন। ড্রয়ারটা খুলিয়া সেই নীল খামের চিঠিখানা আরেকবার পড়িলেন। তাঁহার মুখের কোণে ফুটিয়া উঠিল বিচিত্র একটি হাসি। সারাদিন গুমোটের পর গ্রীষ্মবেলাবসানে যেন ঝির ঝির করিয়া খানিকটা বাতাস বহিয়া গেল। সৌন্দর্য্য, স্নিগ্ধতা, কমনীয়তার পূজারী মিঃ নন্দীর দৃষ্টিশক্তি আজ যেন নূতন করিয়া খুলিয়া গেল।

শান্তভাবে চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া তিনি ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটে ফেলিয়া দিলেন।

নলিনী লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া ঢুকিল। বলিল, ডিনার তৈরী হয়ে গেছে, তুমি হাতমুখটা শীগ্‌গীর করে ধুয়ে নাও।

—হ্যাঁ, যাচ্ছি।

পুরানো চিঠি

—ডিনারের পর মেট্রোয় ছবি দেখতে যাবে? অনেক দিন পর একটা ভালো ছবি এসেছে। প্রতিমাও যেতে চাচ্ছিল।

—ছবি? কী ছবি আছে?

—স্পেন্সার ট্রেসি ও হেডি লামারের বেশ ভালো একটা ছবি।

—প্রেমের কাহিনী ত?···না, তোমরা দু'জনেই দেখে এসো। আমি বরং কালকের কেস্‌টার কাগজপত্র একটু দেখে রাখি।

স্বপন বন্ধুর সন্ধানে

অসীম যে উর্ম্মিলাকে ভয়ানকভাবে ভালোবাসিত সে সম্বন্ধে বন্ধুমহলে কোনদিনই মতদ্বৈধ ছিল না। বন্ধুর দল সুযোগ পাইলেই ঠাট্টা করিয়া বলিত, ওহে অসীম, বৌকে ত সবাই ভালবাসে, তুমি এ আর নূতন কি দেখাচ্ছ···বরং আঁচলের মিষ্টি বন্ধনটাকে একটু উপেক্ষা ক'রে তোমার পুরুষত্বের পরিচয় দাও!

অসীম হাসিত—সুখে এবং গর্ব্বে। তাহার এবং উর্ম্মিলার ভালোবাসাটা যে বিবাহের পরও পুরাতন হয় নাই, তাহাদের ভালোবাসার নিবিড়তা প্রতিনিয়ত বাহিরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ইহা ভাবিয়া তাহার মনে অপূর্ব্ব একটা পুলকের সৃষ্টি হইত। গৃহের শান্ত সুখদ আবেষ্টন হইতে নিজেকে প্রতিসংহার করিবার চিন্তা কোনদিনই তাহার মনে উঠিত না।

আর উর্ম্মিলা সম্পর্কেও এ কথা বলিতেই হইবে যে তাহার মত স্ত্রীর সাহচর্য্যে যে কোন স্বামীর গৃহপ্রীতি শতগুণ বাড়িয়া ওঠা উচিত।

দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট খুঁটিনাটিতেও সে আনিত এমন একটা মাধুর্য্য—এমন একটা স্বপ্নাবেশ—যাহার বন্ধন উপেক্ষা করিয়া পুরুষ-শক্তির একটা শূন্য পরিচয় দেওয়াটা অসীম মনে করিত ঘোরতর মূর্খতা।

ভালোবাসিয়া তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তবু প্রথম প্রেমের উন্মাদনা তাহাদের এতটুকু কমে নাই, সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে দুইটি মনের বিচিত্র লীলাছন্দের এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নাই।

বিবাহিত জীবনের গাঢ় নিবিড়তাকে আরও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল তাহাদের পরস্পরের ঔদার্য্য। অসীম ও উর্ম্মিলার মধ্যে কোন লুকোচুরি ছিল না। ছোট বড়, সাধারণ অসাধারণ, প্রতিদিনের সব কথাই তাহারা নিজেদের কাছে খুলিয়া বলিত···বর্ত্তমানের ঘটনা এবং অতীতের স্মৃতি দুই-ই।

সেদিন অসীম খুব উৎসাহ নিয়া অফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়াছিল। তাহাদের বহু দিনের কল্পনা, কয়েক সপ্তাহের ছুটি নিয়া তাহারা যাইবে আগ্রায়, শা'জাহানের তাজ দেখিতে। কতদিন উর্ম্মিলা স্বামীর বক্ষলীনা হইয়া বলিয়াছে, ওগো, তুমি আমায় কতটুকুই বা ভালোবাস! শা'জাহানের ভালোবাসার কাছে তোমার ভালোবাসা কত সামান্য, তুমি কি কখনো ভেবে দেখেছ?

অসীম প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছে, কিন্তু তবু ত তোমার কল্পনার শা'জাহানের অন্য প্রেমিকার অভাব ছিল না! তাঁর প্রাসাদে দেশ-বিদেশের কত সুন্দরীর অলক্তরাগের দাগ আজও লেগে রয়েছে!

ঊর্ম্মিলা একটুও না হটিয়া জবাব দিয়াছে, ইতিহাস ভালোভাবে পড়নি, তাই এরকম বুলি আওড়াচ্ছ। তুমি কি একেবারেই ভুলে গেলে যে সে সব সুন্দরীর অলক্তরাগ ত দূরের কথা, তাদের মুখের দিকেও শা'জাহান তাকাতেন না। তাঁর মন ছিল· মমতাজে ভরপূর। তাই মরবার শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি তাঁর স্বপ্নসৌধের দিকে না তাকিয়ে তৃপ্তি পাননি!

তর্ক আলোচনার পর স্থির হইয়াছিল, যেমন করিয়াই হউক আগ্রায় যাইতেই হইবে। সেখানে শা'জাহানের মর্ম্মরস্মৃতির উপর দাঁড়াইয়া অসীম প্রমাণ করিবে যে শা'জাহানের এই কীর্ত্তির মাঝে অন্তর নিংড়ানো ভালোবাসা ছিল না এতটুকুও, ছিল শুধু অহমিকার একটা উদ্ধত প্রকাশ। আর ঊর্ম্মিলাও সমান ওজনে জবাব দিয়াছিল, সে দেখাইবে তাজের প্রত্যেকটি পাথর, প্রত্যেকটি ধূলিকণার মধ্যে বাঁচিয়া রহিয়াছে শা'জাহানের অপরিসীম মৃত্যুহীন প্রেম।

তিন সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে, তাই অসীম খুব উল্লাসের সহিত বাড়ীর দিকে রওনা হইয়াছিল। ঊর্ম্মিলা উৎসুক প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে, ছুটি মঞ্জুরের খবরটা পাইলেই তল্পিতল্লা বাঁধিতে সুরু করিবে, এই ছিল তাহাদের আয়োজন।

বাড়ীতে ঢুকিয়া অসীম দেখিল চিরদিন ঊর্ম্মিলা যে ভাবে তাহার প্রতীক্ষায় দোরগোরায় দাঁড়াইয়া থাকে আজ তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। অসীম চিন্তিত হইয়া উঠিল, ঊর্ম্মিলার কোন অসুখ করে নাই ত?

তাড়াতাড়ি সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। দেখিল, উর্ম্মিলা চুপ করিয়া শুইয়া আছে। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, উর্ম্মি, কী হয়েছে? অসুখ করেনি ত'?

উর্ম্মিলা নীরব।

কাছে অগ্রসর হইয়া কপালে হাত দিয়া অসীম দেখিল। না, জ্বর হয় নাই। তবে?

—অফিস থেকে ফিরতে দেরী হয়েছে বলে রাগ করেছ বুঝি?

বলিয়া সে আস্তে আস্তে ঠোঁট দুটি উর্ম্মিলার কপালের কাছে নিয়া আসিল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উর্ম্মিলা উঠিয়া বসিল। বলিল, এসব কপটতা ভালো লাগে না আমার···

কপটতা?···অসীম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিল।

তারপর বলিল, তুমি কী বলছ, উর্ম্মি? আমার ছুটি মঞ্জুর হয়েছে, আগ্রায় যাবার জন্য তৈরী হয়ে নাও···উঠে পড়, টাইম-টেবলটা দেখতে হবে যে!

—আমি আগ্রায় যাবো না···কোথাও যাবো না!···দৃঢ়স্বরে উর্ম্মিলা বলিল।

উর্ম্মিলার কথার সুর কেমন যেন বদলাইয়া গিয়াছে, ভয়ানক কঠিন-ভাবে সে অসীমের কথার জবাব দিতেছে! অসীম বুঝিল একটা কিছু ঘটিয়াছে।

বলিল, আমাকে আর দোদুল অবস্থায় রেখো না উর্ম্মি। বলো, কী হয়েছে?

স্বামীর স্নেহপূর্ণ কথায় উর্ম্মিলার কান্না পাইতেছিল। কোনক্রমে উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া সে বলিল, অমলার কথা ত কোনদিন আমায় ব'লোনি'?

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

অমলা, সে আবার কে ?

একটু বিরক্ত হইয়া অসীম বলিল, কী পাগলের মত যা তা' বক্‌ছ তুমি, উর্ম্মি ? অমলা আবার কে ?

ঝাঁজের সহিত উর্ম্মিলা বলিল, অমলা তোমার কতদিনের চেনা বান্ধবী, তাকে এরই মধ্যে ভুলে গেলে গো ? তোমরা পুরুষমানুষরা এরকমই হৃদয়হীন বটে !

শেষের কথাটাতে বেশ খানিকটা শ্লেষ।

এবার অসীম রীতিমত রাগ করিল। বলিল, শোন উর্ম্মিলা, কে তোমার মাথায় কী ঢুকিয়েছে জানি না। আজ ছুটির খবর নিয়ে অনেক উৎসাহ করে এসেছিলাম, তোমার কাছ থেকে এরকম অভ্যর্থনা যে পাব তা আশা করি নি !

উর্ম্মিলা একটু লজ্জিত হইল, কিন্তু তবু অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আমায় মাপ ক'রো, তিন বছর পরে তোমার কাছ থেকে এতখানি লুকোচুরির পরিচয় পাব তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি···তাই আমার একটু দুঃখ হয়েছিল।

এই বলিয়া সে স্বামীর দিকে একখানা খোলা চিঠি ছুঁড়িয়া দিল।

চিঠিখানা মেয়েলি হাতে লেখা। সোজা ভাষায় যাহাকে বলে প্রেমের চিঠি, এ তাই। লেখা আছে :

"বন্ধু,

জানি আজ হয়ত আমায় চিনে নিতে তোমার অনেক দেরী হবে··· বহু পুরানো স্মৃতির পাতা খুলতে তুমি মোটেই আনন্দ বোধ কর্‌বে না। তোমার শান্ত সুশৃঙ্খল জীবনে চাঞ্চল্য আন্‌তে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তুমি কোথায় কী ভাবে আছ তা নিজের চোখে দেখবার অদম্য

একটা আকাঙ্ক্ষা আমার জেগেছে, তাই তোমার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনাটাকেও উপেক্ষা করে আমি তোমার ওখানে শীগ্‌গীরই যাব স্থির করেছি। দিন ছয়েকের মধ্যেই তুমি আমার টেলিগ্রাম পাবে, ঠিক কোন্ সময় আমি যেতে পারব তার নির্দ্দেশসহ। এখন বিদায়। ইতি—

তোমার বন্ধু অমলা”

চিঠিখানা পড়িয়া অসীম ভ্রূকুঞ্চন করিল। তাহার স্মৃতির 'পাতা উল্টাইয়া দেখিল সেখানে অমলা নামে কোন মেয়েই কোনরকম আঁচড় কাটিয়া রাখিয়া যায় নাই। তবে?

উর্ম্মিলা তীক্ষ্ণভাবে স্বামীর মুখের ভাববৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছিল। সেখানে শুধু একটা প্রহেলিকার ছায়া দেখিয়া সেও অবাক বোধ করিল। তবে কি চিঠিটা মিথ্যা?

অসীম বলিল, আমি কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না উর্ম্মি। অমলা বলে কাউকে ত আমি জানি না!…তাহার কথার মধ্যে একটা না-বুঝতে-পারা হতাশার স্বর।

—তুমি সত্যি বল্‌ছ? সন্দিগ্ধস্বরে উর্ম্মিলা প্রশ্ন করিল।

—সত্যি গো, সত্যি। এটা নিশ্চয়ই একটা বাজে চিঠি, কোন ফক্কড় ছোঁড়ার কাজ।

অসম্ভব নয়। অসীমের বন্ধুদের উপহাসের কাহিনী উর্ম্মিলাও জানে, হয়ত বা তাহাদেরই কেহ একটা নূতন ধরণের ঠাট্টা করিবার উদ্দেশ্যে এরকম চিঠি পাঠাইয়াছে। কিন্তু লেখাটা যে নিতান্ত মেয়েলি! সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইয়া উর্ম্মিলা স্বামীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

অসীম বলিল, আমার মনে হয় এ বিনয়ের কাণ্ড। ওই সব সময় আমাকে ঠাট্টা করে বেশী, আমি নাকি তোমাকে পেয়ে সব পৃথিবী ভুলে গেছি !···কিন্তু···

ঊর্ম্মিলার মনে যে খট্‌কা লাগিয়াছিল অসীমের মনেও তাহারই সুর প্রতিধ্বনিত হইল। বিনয় ত অবিবাহিত···বৌ ছাড়া আর কাহার সাহায্যে মেয়েলি হাতের এমন চিঠি সে পাঠাইতে পারে ?

একটু হাসিয়া সংশয়টা উড়াইয়া দিবার প্রয়াস করিয়া ঊর্ম্মিলা বলিল, তুমিও যেমন বোকা ! বৌ না থাকলে বুঝি কাউকে দিয়ে এরকম চিঠি লেখানো যায় না ? কেন, কত বোন্ দাদার আব্‌দারে এরকম একটা চিঠি লিখে দিতে রাজী হয় ! আজকালকার বোন্‌দের ত তুমি চেন না !

তা' বটে ! ঊর্ম্মিলাকে মৃদু একটা খোঁচা দিবার সুযোগ পাইয়া অসীম বলিল, তুমি বুঝি এরকম করে দাদাদের সাহায্য করেছিলে, ঊর্ম্মি ?

তর্জ্জনী দিয়া অসীমকে আঘাত করিয়া ঊর্ম্মিলা বলিল, আমার আবার দাদা কোথায় ছিল গো, মশায় ?

অসীম তবু হঠে না। বলিল, কেন, তোমার কলেজের বন্ধুদের দাদা একজনও ছিলেন না ?

কপট রোষে চোখ ঘুরাইয়া ঊর্ম্মিলা জবাব দিল, একজন ছিলেন, কিন্তু তিনি এভাবে আমার সাহায্য চান নি। তিনি এসে আমাকে বলেছিলেন, ঊর্ম্মিলা, যদি অভয় দাও তাহ'লে বলি, তোমার ঐ শান্তসুন্দর চোখদুটি আমাকে মুগ্ধ করেছে, তোমার সাবলীল গতিভঙ্গী আমার মনে আনন্দের তরঙ্গ তুলেছে, তোমার টুক্‌রো টুক্‌রো কথা গানের সুর হয়ে আমার চিত্তের মণিকোঠায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে···

স্বপন বসুর সম্মানে

ইহার ইতিহাস আছে। ঊর্মিলার সাথে অসীমের প্রথম পরিচয় হয় তাহার নিজের বোন্ সুমিত্রার দৌলতে। সুমিত্রা এবং ঊর্মিলা ছিল সহপাঠিনী। দু'দিন দেখা শুনার পরই ঊর্মিলাকে অসীমের এত ভাল লাগিয়া গিয়াছিল যে সব রকম দ্বিধা সঙ্কোচ উপেক্ষা করিয়া সে সোজাসুজি তাহার কাছে নিজের মনের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছিল। এই সাহসিকতার জন্য তাহাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই এতটুকুও, তাহার এই আত্মনিবেদন ঊর্মিলাকে চিরস্থায়ীভাবে পাইবার পথটা অনেকখানি সরল করিয়া দিয়াছিল।

এই পুরাতন কাহিনী নিয়া গত তিন বছরের মধ্যে অসীম-ঊর্মিলার মধ্যে কত যে পরিহাস হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ছোট খাট কলহ-দ্বন্দের মধ্যে যখনই তাহারা এই পুরাতন অথচ চিরনূতন দিনটির কথা ভাবিয়াছে তখনই তাহাদের সব কিছু বৈষম্যের সমাধান হইয়া গিয়াছে। তাহাদের পরস্পরকে না-বুঝিতে-চাওয়ার ক্ষণিক স্পৃহাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে বুঝিতে-চাওয়ার চিরন্তন আকুলতা।

আজও সেইভাবে সন্ধিঘোষণা হইল। ঊর্মিলা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া স্বীকার করিল যে তুচ্ছ একটা উড়োচিঠিতে ক্ষণিকের জন্যও আস্থা স্থাপন করিয়া সে অসীমের ভালোবাসার প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছে। অসীমও ঊর্মিলাকে আদর করিয়া বলিল যে তাহার এই ক্ষণিক অনাস্থাটুকু তাহার ভালোবাসার মাধুর্য্যকে বাড়াইয়া দিয়াছে অনেকখানি বেশী।

পরের দিন ভোরের গাড়ীতে আগ্রা রওনা হইতে হইবে। ঊর্মিলা জিনিষপত্র গুছাইতে সুরু করিল।

রাত্রের খাওয়া দাওয়ার পর তাহারা শুইতে যাইবে এমন সময় বাহিরে পিয়ন হাঁকিল, তার হ্যায়, বাবু···

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

শশব্যস্তে দুয়ার খুলিয়া অসীম টেলিগ্রামটি হাতে নিল। দেখিল, আবার সেই বন্ধু!

সুদীর্ঘ টেলিগ্রামে লেখা আছে: "ভোরে তিনটার গাড়ীতে আমি তোমার ওখানে পৌছ্‌ব—অত্যন্ত অভদ্র সময়, মাপ্‌ ক'রো, আর কোন ট্রেণ নেই, সোজা তোমার ওখানে যাব, বৌদি'কে নমস্কার।...তোমার বন্ধু।"

উর্ম্মিলা শঙ্কাকুল ভাবে স্বামীর দিকে তাকাইয়াছিল। প্রশ্ন করিল, কার টেলিগ্রাম? কোন খারাপ খবর নয়ত?

বাঁ হাত দিয়া মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া অস্ফুট একটা "উঃ" বলিয়া অসীম টেলিগ্রামটা স্ত্রীর হাতে তুলিয়া দিল।

উর্ম্মিলা এবার রীতিমত ভুল বুঝিল। স্বামীর এই কাতরোক্তিতে আর তাহার কোন সন্দেহ রহিল না যে অমলা মেয়েটির যথার্থ একটা অস্তিত্ব আছে এবং এতক্ষণ অসীম তাহা লুকাইতে চেষ্টা করিতেছিল মাত্র।... বন্ধুদের পরিহাস? উর্ম্মিলা আর এই সুলভ ব্যাখ্যায় ভুলিবে না।

গম্ভীর ভাবে বলিল, তাহ'লে তোমার অমলার থাক্‌বার আয়োজন কর্‌তে হয়...আমাদের শোবার ঘরটাই ছেড়ে দেই, কী বল?

অসহায়ভাবে অসীম উর্ম্মিলার দিকে তাকাইল। অস্ফুটস্বরে বলিল, আমার মাথায় কিছুই ঢুক্‌ছে না, উর্ম্মি। তুমি বিশ্বাস ক'রো, এখনও আমি বল্‌ছি, এ অমলা কে আমি বিন্দু বিসর্গও জানি না।

স্বামীর অস্বীকারোক্তি গায়ে না মাখিয়া আগেরই মত শান্ত-সংযত স্বরে উর্ম্মিলা বলিল, আমি ত তোমার কাছে জবাবদিহি চাই নি'! আমাকে যখন দয়া করে বৌদি' বলে সম্বোধন করেছে তখন তার উপযুক্ত অভ্যর্থনাও করা আমার উচিত এবং আমি তা' কর্‌ব।

এবার উর্ম্মিলার চোখে এক ফোঁটাও জল আসিল না। অসীমের জন্য তাহার দুঃখ হইতেছিল এবং কেবলই তাহার মনে গুমরাইয়া উঠিতেছিল একটা তীব্র প্রতিবাদ—এরকম কপটতা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল কি? চিঠিটা পাইয়াই যখন উর্ম্মিলা প্রথম সন্দেহ করিয়াছিল এবং স্বামীকে সোজাসুজি প্রশ্ন করিয়াছিল তখন যদি স্বামী সরলভাবে তাঁহার জীবনের একটা গোপন অধ্যায়ের কথা খুলিয়া বলিতেন তাহা হইলেই ত সব মিটিয়া যাইত! যে স্বামীকে সে এত নিবিড়ভাবে ভালোবাসে, যাঁহার মহত্ত্বের কথা ভাবিতেও তাহার বুক গর্ব্বে ভরিয়া উঠে, সেই স্বামী আজ কেন এমন করিয়া নিজেকে ধূলার আসনে টানিয়া নিয়া আসিলেন? আজ যে তাহাদের মধ্যে অভেদ্য একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইতে চলিল ইহার জন্য দায়ী কি অসীম নিজে নয়? তাহার অবিমৃষ্যকারিতায়ই না আজ উর্ম্মিলা আগের মত মাথা উঁচু করিয়া তাহার দিকে তাকাইতে পারিতেছে না!

ক্ষিপ্রহস্তে উর্ম্মিলা তাহাদের গোছান জিনিষপত্র খুলিয়া ফেলিল। আগ্রার তাজ? সে জীবনে কখনও যাইবে না সেখানে। কোন্ অহঙ্কারে সে দেখিতে যাইবে ভালোবাসার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি, যখন সে নিজে এতখানি রিক্তা! তাজের উপর ঠিকরাইয়া-পড়া আলো বারবার প্রকট করিয়া তুলিবে তাহার মনের অমাবস্যা। অপমানে লজ্জায় সে যে মুখ লুকাইবার স্থানও পাইবে না।

অসীম একবার মৃদু প্রতিবাদ করিয়া বলিল, অনেক রাত হয়েছে, উর্ম্মি, এখন না হয় শুতে চলো…

চোখে অগ্নিবাণ বর্ষণ করিয়া উর্ম্মিলা জবাব দিল, তোমার ঘুম পেয়ে থাকে তুমি ঘুমোতে পার, আমি ঘর দোর না গুছিয়ে কিছুতেই স্বস্তি পাব না!

অসীম আরেকবার বলিল, একটু যেন বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি, উর্ম্মিলা ?

উর্ম্মিলা ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর দিল, তোমার চেয়ে বেশী নয়!...তারপর একটুখানি শ্লেষ মিশাইয়া বলিল, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, ঠিক তিনটের সময় যখন তোমার বান্ধবীর আস্‌বার সময় হবে তখন তোমায় জাগিয়ে দেব। আমার মন ত তোমার মত ছোট নয়!

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অসীম একটা ঈজিচেয়ারে হেলান দিয়া চোখ মুদিল। আর ওদিকে শুইবার ঘরে উর্ম্মিলা তাহার স্বামীর বান্ধবীর অভ্যর্থনার আয়োজন আরম্ভ করিল।

মনের এরকম অবস্থায় কি ঘুম আসে? অসীমের বারবারই মনে হইতেছিল যে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে, হয়ত ইহার মধ্যে উৎপীড়নও আছে অনেকখানি। অমলা নাম্নী মহিলা (তিনি কি তরুণী না বয়স্কা?) যখন তাহার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইবেন তখন সে কী বলিবে? তীব্রকণ্ঠে সে বলিবে, আপনার নাটুকেপনা দেখাবার আর জায়গা পান নি?...এখ্‌খুনি বেরিয়ে যান এ বাড়ী থেকে, নইলে পুলিশ ডাক্‌ব।

কিন্তু, না, এভাবে অভ্যর্থনা করা চলিবে না, অন্ততঃ উর্ম্মিলা তাহা হইতে দিবে না। তাহার দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে অমলাকে সে সত্যসত্যই চেনে, সে তাহার বিগত জীবনের অতিপ্রিয় একজন বান্ধবী! উর্ম্মিলা অমলার প্রতি কোনপ্রকার রূঢ় আচরণ মোটেই সহ্য করিবে না। আত্মসম্ভ্রমসম্পন্না উর্ম্মিলা হয়ত অমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া অভ্যর্থনা করিবে,

হয়ত কত মিষ্টভাবে বলিবে, আসুন, আপনি যে এতদিন পরে আপনার পুরানো বন্ধুকে মনে করেছেন তাতে আমরা দু'জনই যে কত খুশি হয়েছি তা বলতে পারি না! আর অমলা (অসীম সাহস তাহার, নহিলে এমনভাবে রাত তিনটায় সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে হাজির হইতে ভরসা পায়?) হয়ত বা কত মিথ্যা কাহিনীই বলিয়া যাইবে, তাহার অজ্ঞাতে এবং তাহাকে কাছে রাখিয়া উভয়তঃই। প্রতিবাদের সুযোগও অসীম পাইবে না, অন্ততঃ উর্ম্মিলা সে সুযোগ দিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে কখন অসীম ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহার মনে নাই। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল যেন সে আগ্রায় গিয়াছে, একা। তাজের সামনে সে দাঁড়াইয়া আছে, আর শা'জাহান যেন আসিয়া খানিকটা করুণামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, ওহে মূর্খ তরুণ, আমার জীবনের পৃষ্ঠা থেকেও কি তোমার শিক্ষা হ'ল না? মমতাজকে আমি ভালোবেসে-ছিলাম বলে কি জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রার মধ্যে আর সব সুন্দরীদেরই এড়িয়ে চলেছিলাম?…স্ত্রীকে ভালোবাস, তাকে শ্রেষ্ঠা প্রেমিকার আসন দাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু পুরুষের অসীম প্রেমের দু'একটি কণা অন্য নারীকে দান করলে প্রেমের যথার্থ মর্য্যাদার লাঘব হয় না, বরং তার গৌরব বাড়ে!…অসীম যেন প্রতিবাদ করিয়া কী বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল উর্ম্মিলার ডাকে।

সুন্দর সংযত বেশে উর্ম্মিলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বলিতেছে, ওগো, আড়াইটে বাজল, তোমার বান্ধবীর আস্‌বার সময় হ'ল, চট্‌পট উঠে পড়ো।

সঙ্কটের মুহূর্ত্তটা যতই অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল অসীম ততই ব্যাকুল বোধ করিতেছিল। উর্ম্মিলার দিকে অপরাধীর মত তাকাইয়া সে বলিল,

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

আমার শেষ মিনতি—আমায় অবিশ্বাস ক'রো না উর্ম্মি, তুমি ছাড়া আমার আর কোন বান্ধবী নেই !

—সে শীগ্‌গীরই দেখতে পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে উর্ম্মিলা বলিল।

ত্রিশ মিনিট ত নয়, যেন ত্রিশ ঘণ্টা ! অসীম এবং উর্ম্মিলা হু'জনেই পাশাপাশি বসিয়া আছে, হুটি চেয়ারে। হুজনেই উৎকর্ণ, অথচ কাহারও মুখে কথা নাই। যেন অত্যন্ত রহস্যময় একটা কিছু ঘটিবার প্রতীক্ষায় উভয়েই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। মিনিট হুই যাইতে না যাইতেই বাহিরে একটা ট্যাক্সির শব্দ পাওয়া গেল। ট্যাক্সিটা তাহাদেরই দোর-গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

উর্ম্মিলা অগ্রসর হইয়া গেল, দরজা খুলিয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করার দায়িত্ব যে প্রধানতঃ গৃহকর্ত্রীর। অসীম বা অমলা কেহই তাহাকে তাহার এই সুপ্রতিষ্ঠিত আসন হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

দরজা খুলিতেই প্রিয়দর্শন একটি যুবক—তাহার স্বামীরই বয়সী হইবে, যদিও দেখিতে দেখায় কলেজে পড়া এক ছোকরার মত—একগাল হাসিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, আপনিই বুঝি বৌদি' ?

বিস্মিতস্বরে উর্ম্মিলা বলিল, হ্যাঁ, কিন্তু অমলা কৈ ?

অবাক্ হইয়া ছেলেটি তাহার দিকে তাকাইল। বলিল, অমলা ? সে আবার কে ?

—কেন ? ওঁর বন্ধু ! ('বান্ধবী' কথাটা উচ্চারণ করিতে যাইয়া জিহ্বার গোড়ায় কেমন যেন আটকাইয়া গেল।)

ততক্ষণে অসীমও দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উর্ম্মিলার কাঁধের উপর উঁকি দিয়া বলিল, উর্ম্মি, এ যে অমল, অমলা নয়!

আগন্তুক ছেলেটি—তাহার নাম সত্য সত্যই অমল—অমল অমলা সম্পর্কিত হেঁয়ালিটা যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। সে খানিকটা অপ্রস্তুত ভাবে প্রশ্ন করিল, আপনি কি আর কারো অপেক্ষা করছিলেন, বৌদি'?

অসীম ইতিমধ্যে উর্ম্মিলাকে পিছনে টানিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। দুই হাতে অমলকে আহ্বান করিয়া বলিল, আরে হতভাগা, তিন বছর পরে তুই যে এমন ধূমকেতুর মত এসে হাজির হবি তা যে আমি কল্পনায়ও আন্‌তে পারিনি'! আয়, শান্ত: হয়ে বোস্, তোর বৌদি তোর জন্যে যা' সব স্পেশাল বন্দোবস্ত করে রেখেছেন তাতে তুই রীতিমত অবাক হয়ে যাবি!

উর্ম্মিলা বোকার মত দাঁড়াইয়া ছিল। তাহা হইলে কি সবই অমলের ষড়যন্ত্র? অমলই কি কোন মেয়েকে দিয়া চিঠিটা লেখাইয়াছিল, যাহাতে এরকম একটা দাম্পত্য-কলহের সূচনা হয়? সেই অভিলাষেই কি সে নিজের নামটা একটু বদ্‌লাইয়া লিখিয়াছিল, অমলা?···কিন্তু অমলের ভাবভঙ্গিতে ত মনে হয় না, সে এই ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও জানে!

অমল চেয়ারে বসিয়া অসীমের দিকে তাকাইয়া বলিল, সত্যি ভাই অসীম, ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না···

অসীম তাহার মাথায় মৃদু একটা আঘাত করিয়া তাহার লেখা চিঠিখানা সম্মুখে ধরিয়া বলিল, এটা কী? এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিস্ ত?··· আর ন্যাকামি করিস্ না।

তবু অমল বুঝিতে পারিল না। হতাশভাবে বলিল, কৈ, এর মধ্যে ত কোন সমাধান খুঁজে পেলাম না!

এবার ঊর্ম্মিলা কথা বলিল, নীচে কী সই করেছেন একটুখানি লক্ষ্য করে দেখুন ত ঠাকুরপো···

—কেন ? আমার নাম···বিস্মিতভাবে অমল বলিল।

—তোর নাম বুঝি অমলা ?···অসীম বলিল।

এবার অমল ভাল করিয়া দেখিল। তাহার পর উচ্চ হাসির রোলে নিস্তব্ধ রাত্রিটাকে মুখরিত করিয়া বলিল, হায় বৌদি, আমার বন্ধুকে অবিশ্বাস করবার একটুখানি সুযোগ পেয়ে আপনার বুদ্ধি বুঝি এতখানি গুলিয়ে গিয়েছিল যে আপনি একটু নজর করে দেখতে পান্‌নি' নাম লেখা আছে অমল, অমলা নয়! শুধু নামের শেষে একটা কালির আঁচড়—তার আপনারা কি নাম দেন জানি না—কী রকম ক'রে মিশে এই অহেতুক অনর্থের সৃষ্টি করেছে।

অসীম ও ঊর্ম্মিলা তবু দমিল না। বলিল, কিন্তু এরকম ভাষায় চিঠি লেখার মানে ? কোন পুরুষ বন্ধু কি কোন পুরুষ বন্ধুর কাছে এভাবে চিঠি লেখে ?

অমল তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, কেন লিখ্‌বে না ?···পুরুষ বন্ধু পুরুষদের কাছে এরকম চিঠি লেখে কিনা জানি না। কিন্তু মেয়েরা তাদের বান্ধবীদের কাছে যে এরকম চিঠি অহরহ লিখে থাকে তার অন্ততঃ ডজন-খানেক প্রমাণ আমি এখখুনি দিতে পারি! আর মেয়েরা যদি তাদের বান্ধবীদের কাছে এভাবে লিখ্‌তে পারে তাহ'লে আমরা ছেলেরা আমাদের অতিপ্রিয় বন্ধুদের কাছে লিখ্‌লেই কি যত অপরাধ ? অসীম, আমাদের পক্ষ সমর্থন করে তুমি অন্ততঃ স্বীকার ক'রো যে আমি অন্যায় কিছু লিখি নি' !

অকাট্য যুক্তি। অসীম হাসিল।

স্বপন বসুর সম্মানে

এবার ঊর্ম্মিলার পালা। বলিল, কিন্তু ঠাকুরপো, মেয়েলি হাতের লেখাটা কোত্থেকে এল ?···তাহার মুখে ঈষৎ হাসি, যেন বলিতেছে, এবার জব্দ !

অমল বলিল, ওঃ··এ যে আমার নিজের হাতের লেখা !...শুধু স্বপন বসুর সম্মানার্থে অক্ষরগুলো একটুখানি যাকে বলে গোলাকার করেছি, এই যা !

—স্বপন বসু ? সে আবার কে ?···অসীম ঊর্ম্মিলা উভয়েই সমস্বরে প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

—স্বপন বসুর নাম শোননি' তুমি, অসীম ?···তা' তোমাকেই দোষ দি' কী ক'রে ? কলেজ ছেড়ে সেই যে মোটা লেজারের আঁক কষতে ঢুকেছ তারপর ত' বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকাবার সময়টুকু পর্য্যন্ত পাওনি' !···স্বপন বসু হচ্ছেন আমাদের তরুণদের আইডিয়াল্, অর্থাৎ আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাঁর একটা থিওরি হচ্ছে এই যে আমরা ছেলেরা ভয়ানক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি সবকিছু সুকুমার এবং কোমল থেকে, যা' প্রতিরোধ করা নিতান্ত দরকার। এবং এটা প্রতিরোধ কর্তে হলে আমাদের ভিড়তে হবে মেয়েদের দলে এবং অবলম্বন করতে হবে মেয়েদের অস্ত্র, মায় তাদের বিচিত্র ভঙ্গীর রেখাবিন্যাস, যার অতি অকিঞ্চিৎকর একটু নিদর্শন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার এই সংযত দুরভিসন্ধি-বর্জ্জিত চিঠিটাতে।

মুক্তি

নন্দিনী স্তব্ধভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। মেঘমেদুর আকাশের শ্যামলিমা, আলোছায়ার লুকোচুরি, বর্ষা আবাহনের সুর—প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যগুলি তাহার সর্ব্বদেহে মনে এক নূতন ঝঙ্কার তুলিতেছিল।

তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। ভাবী স্বামী সমরেশ এম্-এতে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট, জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা উপাধিধারী, কলিকাতার একটা বড় কলেজের নামজাদা অধ্যাপক। তাহার পাণ্ডিত্য সুধী সমাজে সুবিদিত, তাহার আড়ম্বরহীন ব্যবহার সর্ব্বত্র প্রশংসিত, তাহার অমায়িকতায় ছাত্রসম্প্রদায় মুগ্ধ! বয়স তাহার বত্রিশ হইলে কি হয়, তারুণ্যের উচ্ছলতা এখনও ফল্গুস্রোতের মত নীরবে নিভৃতে মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং তাহার আভাস পায় তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুমণ্ডলী।

নন্দিনীর আত্মীয়া বান্ধবী সকলেই তাহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতেছিল। দুই একজনের যে ঈর্ষ্যাও হইতেছিল না এমন নয়।

মুক্তি

সুচিত্রা, যাহাকে সে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে, আসিয়া বলিয়া গিয়াছিল, তুই একটু সাবধানে থাকিস্, নন্দিনী, এ বিয়েতে অনেকেরই বুকে শেল বাজ্‌ছে, শেষ পর্য্যন্ত ভালোয় ভালোয় ব্যাপারটা চুকে গেলে রক্ষা পাওয়া যায়।

ইহার উত্তরে নন্দিনী শুধু হাসিয়াছিল।

সমরেশকে তাহার পছন্দ হয় নাই একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। নন্দিনী অন্ধ নয়, সমরেশের যে সব গুণ তাহাকে সকলের কাছে প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে নন্দিনী জানে। তাহা ছাড়া তাহার নারীত্ব তৃপ্ত হইয়াছিল আরেকটি কারণে: মা-বাবা বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ উপরোধ সুদীর্ঘ সাতটি বৎসর উপেক্ষা করার পর হঠাৎ এক সতীর্থের বাড়ীতে নন্দিনীকে দেখিয়া সমরেশের ভয়ানক ভালো লাগে এবং সে তাহার চিরকৌমার্য্য ব্রত ভাঙ্গিতে রাজী হয়। সমরেশের এই সাদর আহ্বান নন্দিনীর জীবনের শুষ্কতা অনেকখানি দূর করিয়া দিয়াছিল, অভাব বেশ খানিকটা ভরিয়া আসিয়াছিল।

তবু বলিষ্ঠ দুইটি সবল বাহুর নিবিড় আলিঙ্গন লাভের সম্ভাবনায় তাহার মন পুলকিত হয় নাই। কোথায় যেন একটা তার বেসুরো বাজিতেছিল, সে অনুভব করিতেছিল ঠিক যেমনটি হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সুষ্ঠু হইত তেমনটি যেন হইল না।

অলককে নন্দিনী যথার্থই ভালোবাসিয়াছিল। যৌবনের প্রথম আহ্বানে সমস্ত দেহে যখন সে অনির্ব্বচনীয়ের বাণী শুনিতে পাইতেছিল তখন

অলকের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। অলক ছিল তাহার চেয়ে বছর চারেকের বড়—তাহারই মত প্রাণবন্ত, সজীব।

অলক নন্দিনীকে প্রিয়ারূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। নন্দিনীর প্রতি তাহার অনুভূতি ছিল অনেকটা সখ্যভাবের। তাহার স্নেহ ছিল শুভসাধনের, প্রসাধনের নয়।

প্রথমে নন্দিনী এতটুকুও ক্ষুব্ধ হয় নাই। অলকের হৃদয়ের বৈশিষ্ট্যই ছিল একটা বিরাট উদারতা, যাহার মধ্যে বিশ্বের অসংখ্য নরনারী নিঃসঙ্কোচে আসিয়া আশ্রয় নিতে পারে, অথচ বিন্দুমাত্রও ঈর্ষ্যান্বিত হইবার কারণ খুঁজিয়া পায় না। অলক যখন তাহার স্বাভাবিক বেপরোয়া ভঙ্গীতে নন্দিনীকে বলিত, নন্দিনী, তোমার বিয়ে হয়ে গেলে তোমার বর কিন্তু তোমাকে আমাদের বন্ধুগোষ্ঠীতে মিশ্‌তে দেবে না, নন্দিনী কোন প্রতিবাদ করিত না বা বলিত না যে সে কখনও বিবাহ করিবে না। শুধু বলিত, সে দেখা যাবে…।

তাহার পর অলকের জীবনে সত্য সত্যই একটি নারীর আবির্ভাব হইল—বন্ধুর মূর্ত্তিতে নয়, প্রিয়ারূপে। সুকৃতির মধ্যে অলক এমন কতকগুলি বিশিষ্ট বৈচিত্র্য দেখিতে পাইল যে অনায়াসে সে তাহাকে তাহার পরিচিত মেয়েবন্ধুদের দল হইতে আলাদা করিয়া দেখিতে সুরু করিল।

নন্দিনী ব্যথা পাইল। প্রথমটায় সে সুকৃতির সঙ্গে রীতিমত প্রতিযোগিতা করিয়া চলিল, অলকের ভালোবাসা আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে। সুকৃতির চপল চঞ্চলতা, তাহার বিলাসিতা সমস্তই সে অলকের সাম্‌নে উপস্থাপিত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল সুকৃতি অলকের ভালো-বাসার যোগ্যা নহে।

কিন্তু ফল হইল বিপরীত। কোন প্রকার বাধা না পাইলে অলক হয়ত ধীরে ধীরে সুকৃতির আকর্ষণ কাটাইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু এই গায়েপড়া সুকৃতিচরিত্র বিশ্লেষণে সে নন্দিনীর উপর রীতিমত বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং তাহার প্রতি তাহার যে স্নেহটুকু ছিল তাহাও সে তুলিয়া নিয়া সুকৃতির কাছে উৎসর্গ করিল।

ইহার বৎসর খানেক পরে সমরেশের সঙ্গে নন্দিনীর বিবাহ স্থির হইল।

নন্দিনী অন্যমনস্ক ভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছিল, হঠাৎ সুকৃতি আসিয়া উপস্থিত। বেশ একটু ঈর্ষ্যাসূচকস্বরে বলিল, খুব বর জুটিয়েছিস্ যাহোক্, এবার তোকে আর পায় কে ?

সুকৃতির প্রতি প্রীতি নন্দিনীর কোন দিনই ছিল না। সেও উষ্মাসূচক স্বরে জবাব দিল, কলেজে-পড়া ভবঘুরে ছোক্‌রার বদলে ধীমান্ প্রোফেসারের গলায় মালা দিতে কোন মেয়েরই আপত্তি হবে না আশা করি।

সুকৃতি শ্লেষটা বুঝিল, কিন্তু গায়ে না মাখিয়া বলিয়া চলিল, সেটা খুবই সত্যি, নন্দিনী। একজাতের পুরুষের সাথে প্রেম করা চলে, কিন্তু বিয়ে চলে না। বিয়ে—সে যে সারা জীবনের বন্ধন—তখন একটু শান্ত ভাবে ভাব্‌তে হয় বৈ কি !

তাহার পর সে বলিয়া চলিল, অলককে তোর বয়ের কথা বল্‌লাম, সেও খুশি হয়েছে। ও নিজেই তোকে কন্‌গ্র্যাচুলেট কর্‌তে আস্‌ত, কিন্তু বেচারী আজ দিন দশেক ধরে জ্বরে বিছানায় পড়ে আছে, আমাকেই বার্ত্তাবহ ক'রে পাঠাল।

নন্দিনী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

—অলকের জ্বর হয়েছে? কই, কিছু শুনিনি ত! কোথায় আছে? কে দেখ্ছে?

—আছে ওদের বাড়ীতেই। বুড়ী পিসীমা আছেন, যতদূর সম্ভব দেখ্ছেন। ডাক্তার বল্ছিলেন জ্বর যদি এরকম চল্তেই থাকে তাহ'লে একজন নার্স রাখ্তে হবে। আমি ত রোজ বিকেল বেলা একবারটি অলকের খোঁজ নিয়ে আসি, তবে জানিস্ ত, আমার অসংখ্য কাজ, সব দিন একটু বসে কথা বলাও হয়ে ওঠে না!

সুকৃতির কথার মধ্যে একটা উদাসীনতার সুর নন্দিনী লক্ষ্য করিল। সে আরও চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল, সীরীয়াস্ কিছু নয়ত, সুকৃতি?

—না, সীরীয়াস্ কেন হবে? তবে অনেকদিন ধরে জ্বর চল্ছে, বেচারী বড় রোগা আর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, বিছানা ছেড়ে উঠ্তে পার্ছে না।

মুহূর্ত্তের জন্য অলকের চেহারাখানা নন্দিনীর চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। দীর্ঘ ঋজু দেহ, বলিষ্ঠ বাহু, আত্মপ্রতিষ্ঠ মুখশ্রী। কতদিন বক্সিংএ সে বাছাইকরা গোরা বক্সারদের হারাইয়া দিয়াছে, অবলীলাক্রমে। সেই অলক আজ রোগশয্যায় এত কাতর যে বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত নাই!

কিন্তু তাহার নিজের হাত পা যে একেবারে বাঁধা। বাগ্‌দত্তা বধূ সে, কেমন করিয়া অলকের গৃহে যাইবে? তাহার মা ত কিছুতেই রাজী হইবেন না। তাহা ছাড়া যদি সমরেশ শুনিতে পায়?—শত্রুর ত অভাব নাই, সুচিত্রা একটু আগেই তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়া গিয়াছে!

তাহা ছাড়া সে অলকের কাছে যাইবে কোন্ অহমিকায়? অলক ত তাহাকে চায় না, কোন দিন চায় নাই! সে চায় সুকৃতিকে—চঞ্চলা

স্বকৃতিকে, যাহার অলকের প্রতি এতটুকু দরদ নাই।···তাহার বুক ফাটিয়া লাল অশ্রু উদ্গত হইতে চাহিতেছিল।

সংক্ষেপে স্বকৃতিকে বলিল, তোরা ত ভাই রোজই যাস, আমাকে মাঝে মাঝে খবর দিস, কেমন থাকে।

সন্ধ্যায় সমরেশ আসিল। বিবাহ স্থির হইয়া যাওয়ার পর সে প্রায়ই নন্দিনীকে দেখিতে আসে। নন্দিনী তাহার কাছে বিরাট্ একটা কৌতূহল। এতদিন সে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায়ই ডুবিয়া ছিল, এখন যেন একটু ছুটি পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। তরুণ বয়সের রোম্যান্সের উদ্দীপনা হয়ত তাহার নাই, কিন্তু অনুসন্ধিৎসা আছে প্রচুর।

নন্দিনী রোজই সহজভাবে সমরেশের সঙ্গে কথা বলে, তাহার সাথে সাহিত্য, আর্ট, বিজ্ঞান সম্পর্কে তর্ক করে। সমরেশ বেশ প্রোফেসারী গাম্ভীর্য্যে তাহার ভাবী বধূর মানসিক কৃষ্টির উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হয়। তাহার পর হাসিগল্প, বন্ধুবান্ধবীদের কাহিনী ইত্যাদির মধ্য দিয়া কখন যে দুই তিন ঘণ্টা কাটিয়া যায় তাহা সমরেশ টেরই পায় না।

সমরেশের সাহচর্য্য যে নন্দিনী উপভোগ করে না এমন নয়। মনে মনে সে সমরেশের ধীশক্তির প্রশংসা করে, তাহার শান্ত চাঞ্চল্যবিহীন চরিত্রের সম্মুখে মাথা নত করে। সময় সময় অননুভূতপূর্ব্ব একটা গর্ব্বে তাহার বুকও বুঝি ভরিয়া ওঠে।

কিন্তু সেদিন সান্ধ্যমিলনটা অন্যান্য দিনের মত জমিল না। অলকের অসুখের সংবাদ পাইয়া তাহার সংযত-করিয়া-নিয়া-আসা হৃদয় তন্ত্রী আবার যেন কেমন বেসুরে বাজিতেছিল, কথোপকথনের স্রোতে সে কিছুতেই নিজেকে ঢালিয়া দিতে পারিতেছিল না।

অবশেষে সমরেশ প্রশ্ন করিল, তোমার শরীরটা কি ভালো নেই আজ ?

—না, বেজায় মাথা ধরেছে।···নন্দিনী বলিল।

উদ্বিগ্ন হইয়া সমরেশ বলিল, তাহ'লে তোমায় আজ আর আট্‌কে রাখ্‌ব না, তুমি যাও, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।

নন্দিনী জীবনে বোধ হয় কখনও কাহারও কাছে এতখানি কৃতজ্ঞ বোধ করে নাই, আজ সমরেশের এই নিষ্কৃতি দেওয়াতে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

রাত্রিবেলা খোলা ছাদে শুইয়া শুইয়া নন্দিনী অলকের কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, রোগশয্যায় পড়িয়া অলকের চোখের কুহেলিকা নিশ্চয়ই কাটিয়াছে, সে সুকৃতির অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, অন্তরে অন্তরে সে হয়ত নন্দিনীকেই কামনা করিতেছে, কিন্তু ভবিতব্যের নিষ্ঠুর বিধানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

তাহার অদম্য আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল, একবার চুপি চুপি অলককে দেখিয়া আসে। নিভৃতে অলককে প্রশ্ন করে, এখনও তোমার অহমিকার ভুল ভাঙ্গ্‌ল না, অলক ?

কিন্তু চারিদিকে জোড়া জোড়া চোখ তাহাকে পাহারা দিতেছে। অলকের অসুখের সংবাদ নন্দিনীর মা জানেন এবং ইহাও জানেন যে

এতটুকু সুযোগ পাইলে নন্দিনী অলকের রোগশয্যার কাছে ছুটিয়া যাইবে তাই তিনি সব সময় নন্দিনীকে চোখে চোখে রাখিতেছিলেন।

তাহা ছাড়া সমরেশদের বাড়ীও ত বেশী দূরে নয়! মায়ের তীক্ষ্ণ চোখ এড়াইয়া যদিও বা নন্দিনী বাহির হইয়া পড়ে, কে জানে পথের মাঝখানে তাহার সঙ্গে সমরেশেরই দেখা হইয়া যাইবে কিনা! সমরেশ যদি প্রশ্ন করে, এত রাত্রে সে কোথায় যাইতেছে, তাহা হইলে সে কী জবাব দিবে?

এই শৃঙ্খলিত জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার একটা তীব্র আগ্রহ নন্দিনীর মনে গুম্‌রাইয়া গুম্‌রাইয়া মরিতেছিল। আসন্ন বন্ধন এবং তৎসহ আরও বিধিবদ্ধ জীবন যাত্রার সঙ্কেত তাহাকে হয়ত বেপরোয়া করিয়া তুলিত, কিন্তু সুকৃতিকে পাইয়া অলক তাহাকে কী নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল তাহা মনে পড়িতেই সে খানিকটা আত্মস্থ হইল।

পরের দিন অলকের কোন খবরই নন্দিনী পাইল না। তাহার একমাত্র বার্ত্তাবহ সুকৃতি, কিন্তু সুকৃতিকে সেদিন রাত আটটা পর্য্যন্ত দেখাই গেল না।

সমরেশ নন্দিনীর ক্লিষ্ট মুখখানা দেখিয়া বেশ একটু সকাল সকালই বিদায় নিতেছিল, এমন সময় সুকৃতি আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

নন্দিনী স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সুকৃতি, অলকের খবর কী?

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

হাঁফাইতে হাঁফাইতে সুকৃতি বলিল, ঐ কথাই ত ব'ল্‌তে এসেছি, নন্দিনী। আজ বড় ডাক্তার এসেছিলেন, উনি ত দেখে টাইফয়েড্‌ বলে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে গেলেন। বিকাল থেকে দু'জন নার্সের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

নন্দিনীর মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে শাদা হইয়া গেল। পরক্ষণেই সমরেশের কৌতূহলী চোখ তাহার দিকে নিবদ্ধ দেখিয়া সে শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, অলক, আমাদের খুব পুরাতন এক বন্ধুর, আজ ক'দিন থেকে জ্বর, সুকৃতি বল্‌ছে সম্ভবতঃ টাইফয়েড্‌।...ছেলেটি বড় ভালো।

সমরেশ স্বভাবতঃই সহানুভূতিসম্পন্ন। বলিল, তা'হলে ত তোমার তাকে একবার দেখ্‌তে যাওয়া উচিত।

পলকের জন্য নন্দিনীর মন নাচিয়া উঠিল। কিন্তু মায়ের কথা মনে হইতেই ম্লান মুখে বলিল, আজ বাদে কাল বিয়ে। মা যেতে দেবেন না।

—বিয়ে, তাতে কী হয়েছে? বিয়ে হবে ব'লে আত্মীয় বন্ধুদের অসুখবিসুখে যেতে নেই নাকি?...বিস্মিত স্বরে সমরেশ প্রশ্ন করিল।

সুকৃতি এবার নন্দিনীকে উদ্ধার করিল। বলিল, না, তা' নয়, তবে হিন্দুঘরের কতকগুলো সংস্কার আছে জানেন ত, সমরেশ বাবু! নিতান্ত বাধ্য না হ'লে বাগ্‌দত্তা বধূকে অবিবাহিত পুরুষের রোগশয্যায় যেতে নেই, লোকে বলে তাতে অকল্যাণ হয়।

—আমি এসব সংস্কারের মধ্যে কোন লজিক খুঁজে পাই না।...এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সমরেশ সে দিনের মত বিদায় নিল।

মুক্তি

সারারাত নন্দিনী ঘুমাইতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা দ্বন্দ্ব, একটা আলোড়ন চলিতেছিল। অলকের প্রতি তাহার ভালোবাসা কোনদিনই সম্পূর্ণভাবে নিভিয়া যায় নাই, আজ তাহার অসহায় অবস্থার কথা শুনিয়া তাহা সুপ্তোত্থিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িতে লাগিল তুচ্ছ সব ঘটনা, খুঁটিনাটির সমাবেশ। রাত্রির অন্ধকারময় স্তব্ধতার মধ্যেও সে শুনিতে পাইল তাহার রক্তের দ্রুত তাণ্ডব নৃত্য, যখন সে ভাবিতে লাগিল একদিন কী নিরভিমান হইয়া সে নিজেকে অলকের কাছে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল! কিন্তু অলক তাহার উপচার গ্রহণ করে নাই।

তাহার হাত পা যে নিতান্তই বাঁধা! সমরেশের ভাবী বধূ হিসাবে তাহার কর্তব্য এবং আত্মসম্মানবোধ তাহাকে বারবার প্রতিহত করিতেছিল। আর তাহার প্রতি সমরেশের প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাহার অতীত জীবন সম্পর্কে কৌতূহলের অভাব তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছিল।

নন্দিনী স্থির করিল সে সাহস সঞ্চয় করিয়া সমরেশের কাছে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবে। সমরেশের বুদ্ধি ও বিচার শক্তির উপর তাহার বেশ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, সে আশা করিল সমরেশ তাহাকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিবে। সংগ্রামক্ষত মনটার উপর হাসির আলিম্পন আঁকিয়া সহজভাবে বেড়ান তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল।

সমরেশ যখন আসিল সে নিজেই প্রস্তাব করিল তাহারা একটু বাহিরে বেড়াইতে যাইবে। নন্দিনীর শরীর গত কয়েকটা দিন ধরিয়াই অসুস্থ যাইতেছে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সমরেশ কোন প্রশ্ন না করিয়া সানন্দে রাজী হইল।

জীবনের গোপনতম ইতিহাস—যাহা ভাবী স্বামী হয়ত কিছুতেই দরদ দিয়া বুঝিতে পারিবে না—খুলিয়া বলিব এই সাধু সঙ্কল্প করা সহজ, কিন্তু সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করা সহজ নয়। কথা পাড়িতে যাইয়া বারবার নন্দিনীর জিহ্বার আগায় আট্‌কাইয়া গেল।

অবশেষে সমরেশেরই একটি প্রশ্নে নন্দিনী সুযোগ পাইল। সমরেশ জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ, তোমাদের অলক ছেলেটির আর কোন খবর পেয়েছ? কেমন আছে?

—না, আজ কোনই খবর পাই নি। বোধ হয় আগের মতই আছে।

—তোমাদের বাড়ীর অদ্ভুত সংস্কার আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি না। একজন অতি নিকট আত্মীয় বা বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, তুমি বিয়ের ক'নে বলে তোমার যাবার অধিকার নেই, এ আমার কাছে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হয়।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দিনী বলিল, আমার ভয়ানক ইচ্ছা করে একবার দেখ্‌তে যেতে, কিন্তু কুসংস্কার যে আমারও নেই তা' জোর ক'রে বল্‌তে পারি না!

তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া নন্দিনী বলিতে সুরু করিল, সুকৃতির কাছে কাল যা' শুন্‌লাম তাতে মনে হ'ল অসুখে ভুগে ভুগে বেচারী একেবারে বদ্‌লে গেছে। সুস্থ শরীরে ওকে যারা দেখেছে তারা তাকে প্রশংসা না ক'রে পারে নি'...বাংলা দেশে এরকম বলিষ্ঠ, সাহসী, সুদর্শন ছেলে খুব কম মেলে।

বলিতে বলিতে নিজেরই অজান্তে নন্দিনীর মুখ চোখ উৎসাহদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে বলিয়া চলিল, আমরা ওকে জানি ছেলেবেলা

থেকে, খেলার সাথী হিসাবে আমাদের পরিচয়। তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে ও বড় হয়ে উঠ্‌ল···

সমরেশ তাহার কথার মধ্যে বাধা দিয়া বলিল, তোমরাও ত বড় হয়ে উঠ্‌লে···

—হাঁ, সে ত ঠিকই। ···বলিয়া নন্দিনী আবার তাহার কাহিনী সুরু করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার সন্দেহ হইল, সমরেশের এই মন্তব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ নাই ত ?

সে তাহার দিকে তাকাইল।···না, নিতান্ত সাধারণ ভাবেই সে কথাটা বলিয়াছে। তাহার বিগতজীবন সম্পর্কে সমরেশের এই বিরাট ঔদাসীন্য তাহাকে ব্যথিত করিল। সমরেশ কি চিরকালই ধরাছোঁয়ার বাহিরে থাকিয়া যাইবে ? তাহার স্নেহ-ভালোবাসা কি সমস্ত বিবাহিত জীবনে এরকম নিম্নগামীই রহিবে ? নন্দিনীকে তাহার প্রিয়াভাবে সে কি কোনদিন দেখিতে পারিবে না ? সমপ্রাণ সখাসখীর মধুর সম্পর্ক কি তাহাদের মধ্যে কোনদিনই গড়িয়া উঠিবে না ?

যে সূত্র ধরিয়া নন্দিনী তাহার ইতিবৃত্ত বলিয়া চলিয়াছিল তাহা যেন রূঢ় অনম্র একটা আঘাতে হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল। নন্দিনী স্থির করিল, সমরেশের কাছে অলকের কথা আর বলিবে না। সমপ্রাণতার যেখানে অভাব সেখানে সন্দেহের অবকাশ আছে প্রচুর। আজ যদি অলক সমরেশের স্থানে আসীন থাকিত তাহা হইলে হয়ত নন্দিনী তাহার পূর্ব্বরাগের কথা অবলীলাক্রমে বলিয়া যাইতে পারিত। অলকের ঈর্ষ্যা, অলকের অভিযোগের মধ্যে সে বিচিত্র একটা সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইত। কিন্তু সমরেশ অলক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—দুর্ভেদ্য একটা প্রাচীর দিয়া তাহার অন্তঃকরণ সুরক্ষিত, সে প্রাচীর লঙ্ঘন করা নন্দিনীর ক্ষমতাবহির্ভূত।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

নন্দিনী তাহার বন্ধু সুচিতার একটা কথার অন্তর্নিহিত সত্যতা আজ অনুভব করিল। ত্রিশোর্দ্ধে যাহারা বিবাহ করে তাহারা স্নেহ করে, ভালোবাসে না।

ইহার তিনদিন পরে যথারীতি সমরেশের সঙ্গে নন্দিনীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের মধ্যে মালা বদলের সময় নন্দিনীর হাতটা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, আশু একটা দুর্ঘটনার সূচনা সে তাহার স্নায়ুতে স্নায়ুতে অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু দুর্জ্জয় সাহস সঞ্চয় করিয়া সহজ ভাবে সব অনুষ্ঠানগুলিই সে পালন করিল। শান্তমনে নিজের পথ সে বাছিয়া নিয়াছে, প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় ও সুযোগ তাহাকে যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা সে গ্রহণ করে নাই। এখন পরাজয় স্বীকার করিলে চলিবে কেন?

সুক্তির অনুগ্রহে এ'কয়দিন অলকের খবর সে নিয়মিতভাবে পাইয়াছিল। একই ভাবে আছে—টাইফয়েড্ শক্ত অসুখ, দু'একদিনে নীরোগ হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে ডাক্তার বলিয়াছেন ভয়ের কোন কারণ নাই। নার্সের নিপুণ সেবা চলিতেছে, এই অসুখে সেবানৈপুণ্যই বেশী দরকার, সেবাস্নেহের চেয়ে।

বিবাহের রাত্রিতে সমরেশের সঙ্গে এই প্রথম একশয্যায় শুইতে নন্দিনী কোনই সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করে নাই। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার কাছে হাসিমুখে আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ ইহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিল এবং স্বীকার করিয়াছিল।

মুক্তি

তাহার অশান্তি হইতেছিল একটা কারণে। অলকের স্মৃতি সে কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। তাহাকে সব চেয়ে বেশী পীড়া দিতেছিল অলকের এই মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম। অলক যেন কিছুতেই তাহার পরাজয় স্বীকার করিতে চায় না, এতদিন সে সমস্ত বিষয়ে প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আসিয়াও সে যেন মৃত্যুকে উপহাস করিতে চায়। যেন সে জোরগলায় পৃথিবীর কাছে প্রচার করিতে চায়, আমি অপরাজেয়, আমি নির্ভীক, আমি সত্য। ...অলকের বলিষ্ঠ দেহ-মনের ছায়া নন্দিনী সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছিল।

বিবাহের পরদিন নন্দিনীকে স্বামিগৃহে যাইতে হইবে। মা বারবার আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিতেছিলেন। সমরেশের মত শান্ত, ধীর, স্নেহপ্রবণ স্বামীর অঙ্কশায়িনী হইয়া নন্দিনী সুখীই হইবে তাহা তিনি জানিতেন, তবু মাঝে মাঝে তাঁহার স্নেহাশঙ্কিত মনে একটা সন্দেহ খোঁচা দিয়া উঠিতেছিল। তাহা ছাড়া, অলক সম্পর্কিত সংবাদটা—জ্বরের ক্রাইসিস্‌এ সে মৃত্যুর সাথে আপ্রাণ যুদ্ধ করিতেছে—তিনি নন্দিনীর কাছে গোপন করিয়া রাখিলেও তাঁহার মনে হইতেছিল বোধ হয় একবারটি নন্দিনীকে রোগীর কাছে পাঠাইয়া দিলে ভাল হইত!

সানাইয়ের করুণ রাগিনী বাজিয়া উঠিয়াছে। সমরেশ ও নন্দিনী মায়ের পায়ের ধূলা নিয়া বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিবে, এমন সময় ঊর্দ্ধশ্বাসে পাশের বাড়ীর একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল, এইমাত্র অলক মারা গিয়াছে।

নন্দিনীর মুখ ছাইএর মত শাদা হইয়া গেল। তাহার মা রুদ্ধ অশ্রু আর চাপা দিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সমরেশ বলিল, নন্দিনী, চলো, একবার ও বাড়ীতে হয়ে আসি।

নন্দিনী কোন কথা বলিল না। অশ্রুহীন বিবর্ণ মুখখানা তুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে যাইবে।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সমরেশ প্রশ্ন করিল, আমি আস্‌ব, না তুমি একাই যাবে?

সমরেশের এই প্রশ্নে নন্দিনীর মন গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। সে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, তুমি এখানেই থাকো, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আস্‌ছি।

ছুটিতে ছুটিতে নন্দিনী অলকদের বাড়ীতে ঢুকিল। অলকের বৃদ্ধা পিসীমা অলকের বিছানার উপর লুটাইয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতেছেন। নার্স জানালার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রোগীর দেহে প্রাণ নাই এই সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া গিয়াছেন। সুকৃতি একটা চেয়ারে বসিয়া রুমাল দিয়া চোখের জল মুছিতেছে। পাশের বাড়ীর জানালা হইতে কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দল তাকাইয়া আছে—তাহাদের মা তাহাদিগকে জানালা হইতে সরিয়া আসিতে বলিতেছে।

শুভ্র দুগ্ধফেননিভ বিছানার উপর নিমীলিতচক্ষু অলক চির নিদ্রায় নিদ্রিত—আজই সকালে বিছানার চাদর, তাহার গায়ের জামা-কাপড় বদ্‌লাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আঠারো দিনের রোগে ভুগিয়া অলকের দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মৃত্যুর পাণ্ডুরতা ছাপাইয়া তাহার শরীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে যুদ্ধের শ্রান্তি। কিন্তু তাহার মুখের কোণে একটি অনির্ব্বচনীয় হাসি, যেন মৃত্যুর কাছে সামরিক ভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়াও

সে বলিতেছে, আমি যেখানে গেলাম তাহা জন্ম মৃত্যুর বাহিরে, সেখানে আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, তোমাকে পরাস্ত করিব।

নন্দিনী স্তব্ধভাবে অলকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সুকৃতি তাহার বধূবেশ আড়চোখে লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

বেশীক্ষণ নয়, মিনিট দশেক ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নন্দিনী যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল তেমনই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মুক্তি, মুক্তি! আজ সে মুক্তি পাইয়াছে। যে বন্ধনের নাগপাশ তাহাকে এতদিন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল তাহা আজ অযাচিতভাবে খসিয়া পড়িয়াছে। দাম্ভিক অলক শেষ পর্য্যন্ত তাহার মহানুভবতা হইতে এতটুকু ভ্রষ্ট হয় নাই।

সমরেশ নন্দিনীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এত শীঘ্র তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসুনেত্রে সে নন্দিনীর দিকে তাকাইল।

—কী আর হবে ওখানে থেকে, সব শেষ হয়ে গেছে।···শান্ত সহজ সুরে নন্দিনী বলিল।

তাহার পর সমরেশের ডান হাতটি নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়া সে.বলিল, আর দেরী ক'রোনা, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, বাড়ী চলো।

অন্তরালের আলো

মন্দির-দুয়ারে আসিয়া কে যেন ডাকিল, ওগো, কে আছ কোথায়, দুয়ারটি একবার খোলো।

বহু বৎসরের পুরানো মন্দির। সময়ের আঘাতে এর শ্রী হইয়াছে ম্লান, এর দীপ্ত প্রদীপ হইয়া আসিয়াছে নির্ব্বাণোন্মুখ। তবু মনে হয় সময় যে আঘাত দিয়াছে তাহা যেন দরদ মেশানো, তাহার যত কিছু কঠোরতা, যত কিছু গ্লানি সব ছাপাইয়া যেন উঠিয়াছে এক স্বপ্নময় অমরতা।

মন্দিরের পূজারিণী করবী অর্দ্ধনিমীলিত চোখে বসিয়া বসিয়া বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছিল। দেবী সর্ব্বমঙ্গলার দুয়ারের প্রহরী সে। শতবর্ষাধিক কাল ধরিয়া স্বপ্নাদেশ চলিয়া আসিয়াছে, রাত-দুপুর হইতে উষার আলো ফুটিয়া না ওঠা পর্য্যন্ত মন্দির-দুয়ার আগ্‌লাইয়া বসিয়া থাকিবে একজন কেউ। মুহূর্ত্তের জন্যও যদি এই সতর্ক ব্যবস্থায় ফাঁক পড়ে তবে দেবী হয় ত রুষ্ট, কুপিত হইয়া চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের যত কিছু শ্রী, যত কিছু কল্যাণ সব দিগন্ত-রেখায় মিশিয়া যাইবে।

অন্তরালের আলো

মন্দির-দুয়ারের এই প্রহরীর সাথীরূপে কত বর্ষা, শরৎ, বসন্তের বাতাসই না করবীর কানের কাছে চুপি চুপি কথা বলিয়া গিয়াছে!···বয়স যখন তাহার বারো তখন হইতেই সে দেবীর স্বপ্নাদেশ পালন করিবার ব্রত নিয়াছিল। তাহার পর কত বিনিদ্র, অর্দ্ধ-নিদ্র, আলো-ছায়ায় ভরা রাত্রি চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে তাহার ব্রত ভোলে নাই! দিনের পর দিন ব্যগ্র হইয়া অনাগতের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, মানব বিধাতা তাঁহার নিজের হাতে লেখা পুঁথির পাতা একটি একটি করিয়া করবীর সামনে নিয়া দিয়াছেন, তবু অকারণ ঔৎসুক্য তাহার জাগে নাই···পুঁথির লেখক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া যাহা তাহাকে দেখান নাই সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন সে কখনও করে নাই।

কিশোরের সরম-কুণ্ঠিত ঊষা বহুদিন অতীত হইয়া যৌবনের আকুল মধ্যাহ্নে মিশিয়া গিয়াছিল, কিন্তু করবীর মন হইতে সে ঊষার স্বপ্ন আজও মুছিয়া যায় নাই। যৌবনের প্রান্ত-সীমায় আসিয়াও তাহার অন্তরটি ছিল কিশোরীর অন্তরেরই মত—পৃথিবীর খুঁটিনাটির রহস্য সে তাহার ডাগর চোখ দুটি দিয়া সব সময়েই যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিত, অচেনা অজানাকে অনুভব করিবার আনন্দ সব সময়ই যেন তাহার মনকে পুলকাপ্লুত করিয়া রাখিত।

বর্ষার অশ্রান্ত বর্ষণের কোলাহল শুনিতে শুনিতে করবী বোধ হয় এই সব বিগত দিনগুলির কথাই ভাবিতেছিল। এমন সময় সে সচকিত হইয়া উঠিল বাহিরে পথিকের আহ্বানে।

উৎকর্ণ হইয়া সে শুনিল···ভুল হয় নাই ত?

না, সত্যই কে যেন ডাকিতেছে—দুয়ারটি একবার খোলো গো···

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেই একটা দম্‌কা হাওয়া আসিয়া করবীর গেরুয়া রং-এর আঁচলখানি একটু এলোমেলো করিয়া দিল। করবী কোন প্রকারে নিজের স্রস্ত শ্লথ বসনখানা কুড়াইয়া নিয়া রুদ্ধ দুয়ারের অর্গল খুলিতে অগ্রসর হইল।

বাহিরে নিবিড় অন্ধকার—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে, সেই আলোয় বর্ষার চল্‌তি গান বারিধারাগুলি যেন স্বতন্ত্র হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

করবী দুয়ার খুলিয়া আহ্বানকারীর আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

প্রথমে ঢুকিল একটি পুরুষ—প্রশস্ত তাহার ললাট, ঋজু তাহার দেহ। আর তাহারই বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে বাঁধা একটি রমণী।

বিদ্যুতের একটি আলোর রেখায় করবী দুইজনকে একবার দেখিয়া নিল। মেয়েটি পুরুষটির সাথে জড়াইয়া রহিয়াছে নিতান্ত নির্ভরশীলা একটি বল্লরীর মত! মুখখানি তাহার ম্লান, দেহে নীলাভ শাড়ীর রংটি তাহার স্বাভাবিক পাণ্ডুরতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে আরো স্পষ্ট করিয়া।

সৌন্দর্য্যের অভাব যে এককালে ছিল না তাহার চোখ দুইটির উজ্জ্বলতায়ই তাহার প্রকাশ।...করবীর মনে হইল, যেন অতীত এক গরিমার ভগ্নাবশেষ আসিয়া দাঁড়াইল তাহার সম্মুখে, আর তাহাকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে বিদ্রোহী এক আত্মা।

প্রথমে কথা বলিল পুরুষটি।

অন্ধকারের মধ্যে করবীর উপস্থিতি অনুভব করিয়া বলিল, এই অসময়ে আপনাকে যে কষ্ট দিলাম সে জন্য ক্ষমা কর্‌বেন, অন্য কোন উপায় না থাকাতেই এ করতে হ'লো।

স্মিতমুখে করবী উত্তর দিল, এ ত আমার কাজ, এ মন্দির ত অনাহূত পথিকদের জন্যই।

একটু যেন উষ্ণ হইয়া পুরুষটি বলিল, কিন্তু আমি অনাহূত হ'য়ে আজ আসিনি, দেবীর আহ্বানেই এ দুর্যোগ মাথায় করেও এসেছি।

—সে কী ?—করবী বিস্ময়াকুল হইয়া উঠিল।

সাথীটির দিকে নিবিড় স্নেহভরা চোখে একবার তাকাইয়া পুরুষটি বলিল, ইনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী, অনেকদিন ধরেই এঁর রুগ্নতা আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে, অনেক চিকিৎসা করিয়েও কোন ফল হয়নি'। আজ শুয়ে শুয়ে তাই ভাব্‌ছিলাম, ঐকান্তিকভাবে যা কামনা করি তা সফল হয় না কেন ? ভাব্‌তে ভাব্‌তে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় দেবী এসে আমার সাম্‌নে উপস্থিত হ'লেন···

বলিতে বলিতে তাহার মুখচোখ অনন্নুভূতপূর্ব্ব এক রোমাঞ্চে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গভীর স্নেহে সরম-কুণ্ঠিতা বধূর চিবুকটি তুলিয়া ধরিয়া সে বলিতে লাগিল, দেবীর অধরে ঠিক এই রকমের একটি হাসি, যেন আলেয়ার আলো, মনের মধ্যে ধাঁধার সৃষ্টি কর্‌তেই যেন রয়েছে···

সাথীটির পাণ্ডুর মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি পুরুষটির বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিল।

—দেবী এসে বল্‌লেন, ওগো সাধক, তোমার সাধনার মধ্যে ইচ্ছা ত আছে অনেকখানি, কিন্তু ইচ্ছাকে বাস্তবে পরিণতি দেবার মত শক্তি আছে কি ? পরীক্ষায় জিত্‌তে পার্‌বে ত ?···আমি এর জবাবে কী বলেছিলাম মনে নেই, কিন্তু দেবীর মুখের ঈষৎ প্রসন্ন হাসির রেখাটি আমার মনের কোণে এখনও ভাস্‌ছে। দেবী বল্‌লেন, এখ্‌খুনি উঠে তোমার পরিণীতাকে নিয়ে আমার মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনায় বসো। আমি বল্‌ছি তার মুখে দেহে স্বাস্থ্যের শ্রী ও লাবণ্য ফিরে আস্‌বে। আমার এই পূজার নির্ম্মাল্য হবে তোমার স্নেহের গভীরতা, আর আরতির ধূপগন্ধ

বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে তোমার অন্তরের ঐকান্তিকতার ঐক্যতানিক সৃষ্টিতে।...তাই আমি ছুটে এসেছি।

করবী মুগ্ধভাবে আগন্তুকের কাহিনী শুনিতেছিল, আর তাহার প্রত্যেকটি উচ্ছ্বাস এবং আবেগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেছিল। মন্দিরের প্রহরীরূপে এইপ্রকার অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন সে আর কখনও হয় নাই।

বলিল, কিন্তু উষার আলো ফুটে উঠ্‌বার আগে ত দেবীর ঘর খোলা হবে না!

—কেন?

—এ যে চিরদিনের নিয়ম এখানে! তুমি যদি দেবীর পূজায় বস্‌তে চাও তাহ'লে অপেক্ষা কর্‌তে হ'বে।

উষ্ণভাবে পথিক বলিল, দেবীর সাক্ষাৎ আদেশের চেয়েও বড় হবে জড় বিচারহীন অতীতের একটা বন্ধন? তাহ'লে দেবীকে পূজা কর্‌তে শেখেননি' আপনি!

আগন্তুকের কথার ঔদ্ধত্যে প্রথমে করবী একটু স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। পরে মৃদু হাসিয়া সে বলিল, বেশ, তোমাকে আজ আমি অবসর ও সুযোগ দিচ্ছি। আমার এই আঠারো বৎসরের সাধনায় যা পাইনি' তা' যদি তুমি দেবীর কাছ থেকে নিতে পার, তবে আমি বুঝ্‌ব বৃথাই গেছে আমার প্রার্থনা, বিফল হয়েছে আমার আত্ম-নিবেদন।

প্রত্যুত্তরে পুরুষটি শুধু হাসিল। সেই হাসির প্রত্যেকটি কণার মধ্য দিয়া যেন ছিট্‌কাইয়া বাহির হইল তাহার স্নেহাবিষ্ট গভীর আত্ম-প্রত্যয়। সঙ্গিনীর দিকে একবারটি তাকাইয়া যেন আর-কেহ-শুনিতে-না-পায় এমন ভাবে বলিল, পারব না কি গো?

সঙ্গিনী লজ্জায় অভিভূত হইয়া মাথা নত করিল।

অন্তরালের আলো

দেবীর ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিয়া করবী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আর বিদ্যুতের আলো মাঝে মাঝে চম্‌কাইয়া উঠিয়া মন্দিরের চূড়াকে উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে।

উদাসভাবে করবী অশ্রান্ত ধারাবর্ষণের শব্দ শুনিতেছিল। তাহার গায়ে, মুখে, বসনে যে বৃষ্টির প্রহার আসিয়া লাগিতেছিল সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই ছিল না। কী জানি কেন পথিকের সংশয়হীন অকুণ্ঠিত বাণী তাহার মনের মধ্যে গভীর একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।

চোখটা বাহিরের কালো দিগন্ত-রেখার দিক হইতে সরাইয়া নিয়া সে মাঝে মাঝে তাকাইতেছিল দেবীর ঘরের দুয়ারের দিকে, যেখানে সঙ্গিনীকে ব্যাকুলভাবে জড়াইয়া নিয়া পুরুষটি প্রণত হইয়া বসিয়াছিল দেবীর সম্মুখে। প্রদীপের স্তিমিত আলোকে দূর হইতে করবী পুরুষটির মুখের রেখা একটু আধটু দেখিতে পাইতেছিল এবং যতই দেখিতেছিল বিস্ময়ে সে অভিভূত হইয়া উঠিতেছিল। পথশ্রমের সমস্ত অবসন্নতা ছাপাইয়া যেন অভূতপূর্ব্ব একটা আশা ও প্রত্যয়ের আলো পুরুষটির মুখের প্রত্যেকটি রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছিল।

কতক্ষণ যে তাহারা সেই একই ভাবে প্রণত হইয়া ছিল তাহার খেয়াল করবীরও ছিল না। তাহার চেতনা হইল গভীর নীরবতা ভাঙ্গিয়া মৃদু একটি কথায়।

কথা বলিতেছিল পুরুষটি, সঙ্গিনীর দিকে তাকাইয়া।

—দেবীর প্রসন্নতা লাভ করেছি গো, এইমাত্র বল্লেন যে তাঁর অপরিসীম শক্তির কয়েকটি কণা তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন তোমার মধ্যে, এখ্খুনি।

সঙ্গিনীটি উন্মুখভাবে মুখ তুলিয়া তাকাইল, মুখে তাহার দুর্লভ একটি হাসি। সকল সৌন্দর্য্য, রহস্য ও বিপুলতা ফুটিয়া উঠিল তাহার সেই হাসিতে।

কোমল স্নেহে তাহার হাতখানা ধরিয়া পুরুষটি বলিল, এখন চল্‌তে পার্‌বে, নয় কি গো?

সঙ্গিনীটি অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, পার্‌ব···

অবাক্ বিস্ময়ে করবী তাহাদের কাণ্ড দেখিতেছিল। আলো আঁধারের অপূর্ব্ব মায়ার মধ্যে অভিনীত এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার চোখের পলক পড়িতেছিল না।

পুরুষটি সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে উন্মুক্ত মন্দির-প্রাঙ্গণে নিয়া আসিল, এবার তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নয়, দুইটি আঙ্গুলের স্পর্শ দিয়া শুধু।

সঙ্গিনীটি হয় ত বা ক্লান্ত অবসন্নতায় আনত হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু পুরুষটি উৎসাহ-দীপ্ত কণ্ঠে বলিতেছিল, ভয় কি গো, দেবীর শক্তির অমূল্য কণাগুলো যে এসে তোমার গায়ে লেগেছে।

তাহার কথায় ছিল অদ্ভুত এক মাদকতা, উৎসাহে ছিল শ্যামলতার নবীন স্পর্শ। সেই আনন্দেই উদ্‌বুদ্ধ হইয়া পথিকটির সাথী চলিতেছিল নূতন এক ব্যগ্রতায়, আকস্মিকতার পুলকে। তাহার মুখটি যেন রূপান্তরিত হইতেছিল বিদ্যুৎ-রেখায় আঁকা একটি ছবিতে।

ধীরে ধীরে তাহারা দুইজনে মন্দির-দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। করবী ছিল তাহারই একপ্রান্তে—সে একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিল।

গর্ব্বদীপ্ত কণ্ঠে পুরুষটি বলিল, ওগো মন্দিরের সেবিকা, এতদিন দেবী পূজা পেয়েছেন শুষ্ক ভক্তির, তাঁর অর্ঘ্য হয়েছে নির্ব্যক্তিক এক পুষ্পসম্ভার, তাই তিনি সাড়া দেন্ নি।...কিন্তু আজ তিনি তাঁর মায়া-আসন ছেড়ে উঠে না এসে পার্‌লেন না, কারণ আমি যে তাঁকে ডেকেছি পরিপূর্ণ এবং বিপুল বিশ্বাসের অবদান দিয়ে।

অন্য কোন সময়ে করবী কাহারো মুখে এমন উদ্ধত কথা শুনিলে হয় ত তাহাকে তীব্রকণ্ঠে তিরস্কার করিত, তাহার অহমিকাকে চূর্ণ করিয়া দিত নির্দ্দয় অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে। কিন্তু আজ তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। সে শুধু স্তব্ধ হইয়া উদাসভাবে তাকাইয়া রহিল।

উষার মাঙ্গলিক আলো তখন ধীরে ধীরে ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর তাহারই ছটায় প্রকৃতি দেবীর অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছিল বিদ্যুৎ-রেখায় আঁকা তাঁহার স্বপ্নময় রূপ—মেঘের পাহাড়, মেঘের ঢেউ, মেঘের রহস্যময় ঐক্যতানিক সৃষ্টি!

বাধা

ব্রেকফাষ্ট টেবিলে বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

সকালবেলা খবরের কাগজে ডুব দিয়া থাকাটা চিরকালই প্রবীরের স্বভাব, এবং এজন্য স্ত্রী প্রমীলার তরফ হইতে অনুযোগও সে কম শোনে না, কিন্তু আজ তাহার অন্যমনস্কতা যেন চরম সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছিল। খবরের কাগজের পাতা উলটাইতে যাইয়া প্রবীরের ডান হাতটা গিয়া পড়িল তাহারই সম্মুখে স্থাপিত তাহার জন্য তৈরী গরম চায়ের পেয়ালার উপর এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে চা দুধ বিশৃঙ্খলভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া নূতন টেবিল-ক্লথটাকে ত নষ্ট করিলই, অধিকন্তু তাহার একটা ঝলক গিয়া পড়িল প্রমীলার অতি সখের হাল্কা সবুজ রংএর জর্জ্জেট শাড়ীটার উপর।

প্রবীর অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া ছড়ানো পেয়ালা এবং দুধের পাত্রটাকে সামলাইতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রীর ভ্রুকুটির সম্মুখে কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া সে জড়ভরতের মত তাহার চেয়ারে স্থানু হইয়া বসিয়া রহিল।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে কোন স্ত্রী তাহার সখের শাড়ীর এরকম দুরবস্থায় রুষ্ট হইবেই, বিশেষ করিয়া সেই দুরবস্থা যদি ঘটে তাহার স্বামীর অতি একগুঁয়ে অভ্যাস-দাসত্বের জন্য। কিন্তু প্রমীলার বিরক্তিও যেন আজ সীমা অতিক্রম করিয়া গেল।

কোলের ন্যাপ্‌কিনটা স্বামীর মুখের দিকে বেশ একটু জোরের সহিতই নিক্ষেপ করিয়া প্রমীলা টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভোলা মনের নমুনা ত রোজই দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু আজ আমার সকাল বেলার যাত্রাটা ইচ্ছা ক'রে পণ্ড না কর্‌লেই পার্‌তে।

প্রবীর বলিতে যাইতেছিল প্রমীলার যে শাড়ীটা নষ্ট হইয়াছে তাহার জোড়া বাজারে দুষ্প্রাপ্য নহে, কিন্তু সে তাহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই গট্‌ গট্‌ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আসলে কিন্তু কাণ্ডটা ঘটিয়াছিল প্রবীরের অন্যমনস্কতার জন্য নহে। সেদিনকার কাগজের ছোট্ট একটি খবরই ছিল ইহার জন্য দায়ী।

খবরটা আর কিছুই নয়, পশ্চিমের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ শিবরাম ব্যানার্জ্জি সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়াছেন, বড়দিনের আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিতে।

পাঠকপাঠিকারা নিশ্চয়ই ভাবিতেছেন, এই খবরের মধ্যে এমন কী আছে যাহা প্রবীরের স্নায়ুগুলিকে হঠাৎ এতখানি চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে? বড়দিনের সময় কলিকাতায় ত এ রকম অনেক ধনী এবং সৌখীন ব্যক্তিরই আনাগোনা হইয়া থাকে, শিবরাম বাবুও যে আসিবেন তাহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কী আছে?

কিন্তু যাহারা প্রবীরের জীবনের ইতিহাস জানে তাহারা তাহার এই চাঞ্চল্যে মোটেই বিস্মিত হইবে না। শিবরাম ব্যানার্জির পত্নী সুমিত্রা ব্যানার্জির কলিকাতায় আসার সংবাদই প্রবীরকে হঠাৎ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

সে প্রায় আট বছর আগেকার কথা। প্রবীর তখন সবেমাত্র কলেজ ছাড়িয়া য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকিয়াছে। সুমিত্রা গাঙ্গুলী (তখনও সে শিবরাম ব্যানার্জির স্ত্রী হয় নাই) ও প্রবীরের পরস্পর জানাশোনা বেশ একটু রোম্যাণ্টিক স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে।

সুমিত্রার বাবা কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার, অর্থ গৌরবও তাঁহার প্রচুর। মেয়ে যখন আঠারোর কোঠায় পা দিয়াছে তখন হইতেই তিনি ভাবিতে সুরু করিয়াছেন হয় কোন আই-সি-এস্ না হয় কোন ধন-কুবেরের সাথে তাহার বিবাহ দিবেন।

সুমিত্রা অবশ্য তাহার বাবার এই উচ্চাভিলাষের কথা ঠিক বুঝিতে পারে নাই, তাই অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে প্রবীরের সাথে মিশিতে তাহার কোনই দ্বিধা ছিল না। দু'জনের মধ্যে মধুর একটি বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং প্রবীরের দিক দিয়া তাহা অতি শীঘ্রই রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল ভালোবাসায়, যদিও সুমিত্রার মনের অবগুণ্ঠন তখনও সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হয় নাই।

প্রবীরকে তাহার এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সে—বড়লোকের মেয়ে সুমিত্রার কাছে

বাধা

যাহা ছিল সহজ লীলা চপলতা, প্রবীরের চোখে তাহা আনিত এক নেশার আমেজ। সুমিত্রার টুক্‌রা টুক্‌রা কথা, তাহার আন্তরিক প্রীতি, প্রবীরের কাছে প্রতিভাত হইত নবীন শ্যামল মেঘের প্রথম প্রসাদবৃষ্টির মত। অবশেষে একদিন সে দুঃসহ সাহসে বলীয়ান্‌ হইয়া সুমিত্রার কাছে তাহার মনের গোপনতম কথাটি খুলিয়া বলিল।

সুমিত্রার হৃদয়াভ্যন্তরালেও ইহার প্রতিধ্বনি ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে সমস্তই কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গেল। প্রবীর সুমিত্রাকে ভালোবাসিলেও তাহাকে বিবাহ করিবার মত মনের জোর সঞ্চয় করিতে পারিল না। ধনী গৃহে অতি আদরে পালিতা দুহিতা তাহাদের বিধিবদ্ধ গৃহে হয়ত নিজেকে মানাইয়া নিতে পারিবে না এই সন্দেহে তাহার ভালোবাসার তীব্রতা সাময়িকভাবে কমিয়া আসিল। এদিকে আই-সি-এস জামাতা সহজলভ্য নয় দেখিয়া সুমিত্রার বাবা ধনী ব্যবসায়ী মিঃ শিবরাম ব্যানার্জ্জির সঙ্গে মেয়ের বিবাহ স্থির করিলেন এবং সুমিত্রাও ব্যবহারিক জীবনে প্রবীরের কল্পনাবিলাসী প্রেমের চেয়ে শিবরাম ব্যানার্জ্জির সাদর অভ্যর্থনার মূল্য বেশী উপলব্ধি করিয়া এই বিবাহে রাজী হইয়া গেল। প্রবীরের প্রথম পূজার ডালি তাহার মানসী হয়ত সানন্দেই গ্রহণ করিত, কিন্তু দুরধিগম্য সংশয় এবং সঙ্কোচ তাহাকে একটা সীমারেখার বাহিরে যাইতে দিল না।

বৎসর দুই পরে প্রবীর তাহারই মত মধ্যবিত্ত এক পরিবারের মেয়ে প্রমীলাকে বিবাহ করিল।

প্রমীলাকেও সে পছন্দ করিয়াই বিবাহ করিয়াছিল। প্রথম প্রেমের উদ্দাম উচ্ছ্বাস সে হয়ত প্রমীলা সম্পর্কে অনুভব করে নাই, কিন্তু তাহাকে তাহার ভালোই লাগিয়াছিল এবং সে আশা করিয়াছিল তাহাদের বিবাহিত জীবন সহজ ছন্দে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু বিবাহের বৎসর খানেকের মধ্যেই সে দেখিল, প্রমীলার মধ্যে যে শান্ত গৃহলক্ষ্মীকে সে দেখিতে পাইবে ভাবিয়াছিল তাহার স্থান অতি দ্রুতগতিতে অধিকার করিতেছে একটি গর্ব্বোদ্ধতা সুখবিলাসী নারী। প্রবীর তাহার য়ুনিভার্সিটির সম্মানজনক ডিগ্রীর কল্যাণে শীঘ্রই একটা মোটা চাকুরী জোগাড় করিয়া ফেলিল এবং তাহার এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলাও কেমন যেন বদ্‌লাইয়া গেল। যে প্রমীলা ইতিপূর্ব্বে অভিজাত সমাজের ছায়াও মাড়াইত না সে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাড়ীতে পার্টি, বিলাতি হোটেলে বল্‌নাচ ও ডিনার, তুর্ক রীলিফ ফাণ্ডের জন্য চ্যারিটি অভিনয়—ইহার প্রত্যেকটিতে প্রমীলা বিশিষ্ট অংশ নিতে সুরু করিল।

প্রবীর প্রথমটায় একটু আপত্তি করিয়াছিল। বলিয়াছিল, সংসারের সুখনীড়ে বাহিরের এই সমস্ত উপসর্গ না আনাই ভাল। কিন্তু প্রমীলা স্বামীর এই আপত্তিতে কান দেয় নাই।

হয়ত প্রবীরের প্রতি প্রমীলার কিছু অভিযোগও ছিল। স্বামীর মুখেই সে তাহার প্রথম জীবনের উচ্ছ্বাসের কাহিনী শুনিয়াছিল এবং যেটুকু প্রবীর ভালোভাবে গুছাইয়া বলিতে পারে নাই তাহা সে তাহার বুদ্ধি দিয়া কল্পনা করিয়া নিয়াছিল। প্রবীর যে তাহাকে নিছক সুবিধার জন্য বিবাহ করিয়াছে এই অনুভূতি তাহাদের পরস্পরের স্নেহের সম্পর্কটাকে অনেকখানি শিথিল করিয়া আনিয়াছিল।

কিন্তু বিবাহের প্রথম দুই বৎসর স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যে প্রমীলা এতটুকুও ক্রটি করে নাই। তাহার পরিবর্ত্তন দেখা দিল তাহাদের প্রথম সন্তান অশোকের জন্মের মাস ছয়েক পরে। পত্নী এবং মাতা দুইভাবে প্রবীরের প্রতি তাহার সযত্ন কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া প্রমীলা শান্ত বিবেকে অভিজাত সমাজের ঘূর্ণিপাকে নামিয়া পড়িল।

প্রথমে প্রবীর দুঃখ পাইয়াছিল—সে প্রমীলার কাছে আশা করিয়াছিল শান্তি, স্নেহ, পরিচর্য্যা। প্রমীলা যখন বিধিবদ্ধ প্রণালীতে তাহার দেয় স্নেহটুকু তাহাকে দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল তখন সে ক্ষুব্ধ হইলেও কোন অভিযোগ করিতে পারিল না। পুরানো জীবনের পাতা উল্টাইয়া সান্ত্বনা পাইবার মত বয়স এবং উদ্দীপনাও তাহার চলিয়া গিয়াছিল, কাজেই উভয়তঃ বঞ্চিত হইয়া সে তাহার বই এবং খবরের কাগজে মনকে নিয়োজিত করিতে চেষ্টা করিল।

তাহার জীবনে হাসির টুক্‌রা স্বরূপ রহিল তাহার ছেলে অশোক। যে স্নেহ সে প্রমীলাকে দিবার জন্য আন্তরিকভাবে উৎসুক হইয়াছিল তাহা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া অশোকের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল।

সুমিত্রার কথা সে ভাবিত না। সে জানিত সুমিত্রা একরকম স্বেচ্ছায় ধনী মিঃ শিবরাম ব্যানার্জ্জিকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার জীবনে কোন অসম্পূর্ণতা নাই। তাহা ছাড়া প্রমীলার আর যে ক্রটিই থাকুক না কেন, গতানুগতিক পাতিব্রত্যে তাহার এতটুকুও ভুলচুক হয় নাই। কাজেই আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন, দৃঢ়নিয়ন্ত্রিত প্রবীর তাহার নোঙ্গরহীন মনকে প্রতিক্রিয়া হিসাবেও সুমিত্রা সম্পর্কে কল্পনা বিলাসে ডুবাইতে সমর্থ হইল না।

কিন্তু সেদিনকার খবরের কাগজের ঐ সংবাদটুকু তাহার বাঁধাধরা জীবনযাত্রাকে কেমন যেন এলোমেলো করিয়া দিল। রুষ্টা প্রমীলা যখন গট্‌গট্‌ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল তখন প্রবীরের হঠাৎ মনে হইল, সুমিত্রা কখনই এরকম করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিত না !···তাহার মনে হইল, আজ যদি সে অন্যমনস্কভাবে সুমিত্রার ইহার চেয়েও দামী একটা শাড়ী নষ্ট করিয়া ফেলিত, সুমিত্রা তাহাকে শুধু একটা মৃদু তিরস্কার করিত, হয়ত বলিত, ছিঃ, এরকম ভুলো তুমি, চা ফেলে শাড়ীটার কী কর্‌লে বলো দেখি ! ···তাহার পরই প্রবীরের অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া সে হয়ত তাহার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইত। প্রবীরের মাথাটা তাহার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিত, ওঃ ছাই, কল্‌কাতা সহরে শাড়ীর ত আর অভাব নেই, আস্‌ছে মাসে আমাদের বিয়ের দিনে না হয় তুমি এর চেয়েও সুন্দর আরেকটা শাড়ী কিনে দিয়ো, কেমন ? প্রবীর হয়ত শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায় সুমিত্রাকে তাহার আরও কাছে টানিয়া আনিত, এই সামান্য ঘটনাটার পরিসমাপ্তি হইত নিবিড় আলিঙ্গনে, অধর স্পর্শে।

—বাবা, বাবা, দেখো আজ তোমার জন্য কেমন সুন্দর ফুল নিয়ে এসেছি।···বলিতে বলিতে তাহার পাঁচ বৎসরের ছেলে অশোক ঘরে ঢুকিল।

প্রবীর তাহার দিবাস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া বসিল।

অশোককে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া সস্নেহে তাহার উচ্ছৃঙ্খল চুলগুলি কপাল হইতে সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, বাঃ, ভারী সুন্দর ফুল ত ! কোথায় পেলে, বাবা ?

উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে অশোক বলিল, আজ সেই নতুন পার্কে গিয়েছিলাম যে ! সব গাছে ফুল হয়েছে—লাল, নীল, হল্‌দে। তুমি বিকেলবেলা চলো, আমি তোমায় নিয়ে যাবো !

বাধা

ছেলের অভিভাবকত্বে নিজেকে ছাড়িয়া দিতে প্রবীরের এতটুকুও আপত্তি নাই। সে গলা মিলাইয়া বলিল, নিশ্চয়ই যাবো! তা এ ফুলগুলো তুমি আমার লাইব্রেরী ঘরে রেখে এসো, কেমন? সেই যে টেবিলের উপর কাঁচের ফুলদানীটা আছে, তার মধ্যে।···দেখো, ভেঙ্গে যেন না যায়!

—না, ভাঙ্গবে না, বাবা।···বলিতে বলিতে অশোক তাহার বাবার হুকুম তামিল করিতে ছুটিল।

প্রমীলা তখন নিজের বেশভূষা বদ্‌লাইয়া বাহিরে যাইতেছিল। অশোক মাকে দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। সে মাকেও ভয়ানক ভালোবাসে, মাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাইতেছে, অশোক মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া রহিল।

প্রমীলা অশোককে ছুটিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি কোথায় ছুট্‌ছ, অশোক?

অশোক সোৎসাহে জবাব দিল, বাবার পড়্‌বার ঘরে, আমি ফুল এনেছি যে, বাবা তার ঘরে রেখে দিতে বল্‌ল···

মুহূর্ত্তের জন্য প্রমীলার মুখে রূঢ়তার একটা ছায়া আসিয়া পড়িল, কিন্তু তাহা সে সাম্‌লাইয়া নিয়া নীচু হইয়া অশোককে একটা চুমু খাইয়া বলিল, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, অশোক, তুমি মামণির জন্য চেঁচামেচি ক'রোনা যেন!···বলিয়া স্বামীর দিকে একবারও না তাকাইয়া সে বাহিরে যাইয়া তাহার এক বন্ধুর মোটরে উঠিল।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

প্রবীরের সেদিন অফিস ছুটি—রবিবার। বাড়ীতে একা একা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। লাঞ্চএর অনেক দেরী আছে, প্রমীলা কখন ফিরিবে কিছুই বলিয়া যায় নাই, খানিকক্ষণ লাইব্রেরী ঘরে পুরানো বই খাতা নিয়া নাড়াচাড়া করিয়া সে শ্রান্তিবোধ করিতেছিল। অবশেষে সে স্থির করিল, গ্রেট ঈষ্টার্ণে লাঞ্চ খাইতে যাইবে। টেবিলের উপর ছোট্ট এক টুকরা কাগজে প্রমীলার জন্য এই সংবাদটুকু রাখিয়া সেও বাহির হইয়া পড়িল।

প্রথমেই নিউমার্কেটে যাইয়া সে ছেলের জন্য মস্ত বড় একটা কাঠের ঘোড়া কিনিল। অশোক অনেকদিন যাবৎ বাবার কাছে তাহার এই আবেদন জানাইয়াছে, প্রবীর নানাকাজের ভিড়ে তাহা মঞ্জুর করিতে পারে নাই। আজ অশোকের প্রতি প্রমীলার ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ঔদাসীন্য দেখিয়া সে দুঃখবোধ করিতেছিল এবং যাহাতে তাহার শিশুমনের উপর কোন প্রকার ছায়া না পড়ে সেই উদ্দেশ্যেই সে আজ এই উপহারটি কিনিয়া নিয়া চলিল।

নিউ মার্কেট হইতে বাহির হইতেছে এমন সময় প্রকাণ্ড একটা গাড়ী আসিয়া প্রধান প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল সুমিত্রা—একা।

সুমিত্রা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই এখানে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবীরের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়া যাইবে। পলকের জন্য সে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের রক্তের দোলা অসংখ্য শিরা উপশিরা অতিক্রম করিয়া তাহার সুগৌর মুখে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রবীরও চম্‌কাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সুমিত্রার মত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সে হয় নাই। এতক্ষণ তাহার মনের আনাচেকানাচে আট বৎসর আগেকার

স্মৃতি ঘুরিয়া ফিরিতেছিল বলিয়াই হয়ত সে আত্মস্থ থাকিতে সমর্থ হইয়াছিল।

স্বপ্নজড়িতস্বরে সুমিত্রা প্রশ্ন করিল, তুমি, প্রবীর?

—হ্যাঁ, আমি, সুমিত্রা। তুমি কল্‌কাতায় এসেছ খবরটা আজ সকালবেলায় পেয়েছি, একজন নিজস্ব সংবাদদাতার অনুগ্রহে। তা' তোমার স্বামী, মিঃ ব্যানার্জ্জি, কোথায়?

সুমিত্রা হাসিল। এতক্ষণে সে তাহার আড়ষ্টতা কাটাইয়া উঠিয়াছে। বলিল, উনি চলে গেছেন ওঁদের কোন্ এক কারখানা দেখ্‌তে, বারাকপুরের দিকে। গাড়ীটা রেখে গেছেন আমার ব্যবহারের জন্য।

প্রবীর ভাবিতেছিল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই প্রকাশ্যস্থানে আর বেশী কথোপকথন করা সঙ্গত হইবে কি না। সুমিত্রা বোধ হয় তাহার মনের দ্বিধা বুঝিতে পারিল। সে নিজেই বলিল, কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা, না?···প্রায় ছয় বছর হবে!

প্রবীর তাহার ভুল শুধ্‌রাইয়া বলিল, ছয় বছর কী বল্‌ছ, আস্‌ছে জুলাই-এ আট বছর পূর্ণ হবে!

চটুল হাসি হাসিয়া সুমিত্রা বলিল, তোমার স্মৃতিশক্তি দেখ্‌ছি আগের মতই প্রখর রয়েছে···আমি ত সব গোলমাল ক'রে ফেলেছিলাম। সে যা হোক্, চলো, মার্কেটে ঢুকে পড়ি, আমার একটা শাড়ীতে আজ চা পড়ে বিশ্রী দাগ হয়ে গেছে, এরা সেটা তুলে দিতে পার্‌বে কিনা একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।

প্রবীর প্রথমে ভাবিল সুমিত্রা উপহাস করিতেছে। পরক্ষণেই মনে হইল, উপহাস করিবে কেন? সুমিত্রা ত কিছুতেই জানিতে পারে না আজ তাহার গৃহেও শাড়ী এবং চা নিয়া কী ঘটনা ঘটিয়াছে!···কিন্তু আজকার

দিনটাতেই সুমিত্রার শাড়ীও চায়ে নষ্ট হইয়া গেল! ঘটনার এই অদ্ভুত সমাবেশ তাহার কাছে কেমন যেন রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হইল। সে মুখে কিছু বলিল না, কুলীকে অশোকের খেলনাটা তাহার নিজের গাড়ীতে তুলিয়া দিতে বলিয়া সে নীরবে সুমিত্রার সঙ্গে আবার মার্কেটে ঢুকিল।

মার্কেটের কাজ যখন শেষ হইল তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। প্রবীর প্রশ্ন করিল, এখন কি বাড়ী ফিরে যাচ্ছ?

সুমিত্রা জবাব দিল, না, আজ সারা দিন রাতের মত ছুটি। বাইরেই কোথাও খেয়ে নেব।

—তাহ'লে চলোনা গ্রেট ইষ্টার্ণে, আমিও আজ বাইরেই লাঞ্চ খাচ্ছি।… অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে!

—প্রবীর, তুমি আজকাল আদবকায়দা একটু বেশী শিখেছ।…… বলিয়া হাসিয়া সুমিত্রা জানাইল সে সানন্দে প্রবীরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে।

প্রবীর তাহার নিজের গাড়ীটা বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া সুমিত্রার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

গ্রেট ইষ্টার্ণের নিভৃত একটি কোণ খুঁজিয়া নিয়া উভয়ে বসিল। প্রবীর বিস্মিত হইয়া গেল সুমিত্রার সপ্রতিভতায়, তাহার হাস্যচটুল কথাবার্ত্তায়। আট বৎসর আগে তাহাদের মধ্যে যে আনন্দমধুর বেদনার অনুভূতি জাগিয়াছিল তাহার এতটুকুও যেন চিহ্ন নাই সুমিত্রার লীলাচপল জিজ্ঞাসায়, তাহার সহজ স্নিগ্ধ উত্তরে।

বাধা

—তোমার খবর বলো, প্রবীর। শুনেছি তুমি নাকি বেশ বড় একটা ফার্মে ঢুকেছ, শীগ্‌গীরই ম্যানেজার হবার সম্ভাবনা আছে।……আমার অভিনন্দন জেনো।

—আমার খবর খুবই মামুলী, সুমিত্রা।…বছর ছয়েক হ'লো বিয়ে করেছি, তার কিছুদিন পরই এই চাকুরীটা জুটে গেল, এখন মোটামুটি আছি ভালই। …একটি ছেলে হয়েছে, তার নাম রেখেছি অশোক।

ছেলের উল্লেখে সুমিত্রা যেন বেশী কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

—তাই নাকি? তা হ'লে তোমার খোকাকে ত একদিন দেখ্‌তে যেতে হবে! কত বড় হয়েছে?

—পাঁচ বছর।

—পাঁচ বছর? তাহ'লে ত বেশ বড় হয়েছে। তা' সে তার বাবার মতই হয়ে উঠছে না ত?—রোম্যান্টিক, অথচ রোম্যান্সকে প্র্যাকটিক্যাল ভাষা দেবার বেলায় যত সঙ্কোচ, দ্বিধা!

কথাটার মধ্যে কি প্রচ্ছন্ন একটা শ্লেষ নিহিত ছিল?

প্রবীর একটু আহত বোধ করিল। বলিল, সুমিত্রা, মানুষ জীবনে ভুল করে, কিন্তু সে ভুলের জন্য যদি তার অনুশোচনা হয়ে থাকে তাহ'লে তাকে সে সম্বন্ধে ভৎ‍র্সনা না করাই কি বন্ধুত্বের পরিচায়ক নয়?

প্রবীরের মৃদু তিরস্কারে সুমিত্রা লজ্জিত এবং বিস্মিত বোধ করিল। তাহার ধারণা ছিল বিগত জীবনের ইতিহাস নিয়া মনকে ভারাক্রান্ত করা প্রবীরের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কিন্তু সহসা এই অনুশোচনার উল্লেখে সে নিজেও যেন কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

প্রবীর বলিল, আমার কাহিনী ত সবই শুন্‌লে, এবার তোমার—তোমার ছেলেমেয়েদের—কথা শুনি।

ম্লান হাসি হাসিয়া সুমিত্রা বলিল, আমি সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত।

—সে কী?···বিস্মিত ভাবে প্রবীর প্রশ্ন করিল।

তেমনই ম্লান স্বরে সুমিত্রা বলিল, সত্যি তাই।···আমার জীবনের এই দিকটা বোধ হয় অপূর্ণ ই রয়ে গেল।

প্রবীর কী বলিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। সুমিত্রার এই দুর্ভাগ্যে তাহার অন্তর মথিত করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

কথোপকথনের মধ্যে একটু প্রফুল্লতা আনিবার প্রয়াস করিয়া সুমিত্রা বলিল, তার জন্য দুঃখ ক'রে ত কোন লাভ নেই, প্রবীর। জীবনে যা' আমরা কামনা করি সবই যদি পেতাম তাহ'লে তার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে শিখ্‌তুম না। ···ঐশ্বর্য্য, বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য সবই পেয়েছি, স্বামীর ওজনকরা স্নেহের দামও আমি আজকাল দিতে শিখেছি, যদি কিছু অসম্পূর্ণতা থেকেই থাকে তা' নিয়ে প্রকাশ্যভাবে অভিযোগ ক'রে নিজেকে ছোট করতে চাই না।

বলিয়া প্রবীরের দিকে তাকাইয়া সুমিত্রা হাসিল।

লাঞ্চের বাকী সময়টা নিঃশব্দেই কাটিল। প্রবীরের ব্যথিত সহানুভূতি-প্রবণ মন আজ যেন একটু বেশী দরদী, একটু বেশী সাহসী হইয়াছিল। সে নিঃসঙ্কোচে সুমিত্রার হাতের উপর নিজের হাতটা একবার রাখিল। সুমিত্রা কোন আপত্তি করিল না।

লাঞ্চ শেষ করিয়া বিল্ চুকাইয়া দিয়া উভয়ে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল সুমিত্রা প্রশ্ন করিল, তোমাকে তোমার বাড়ীতে আগে পৌঁছে দি', কেমন?

প্রবীর ইহার কোন জবাব না দিয়া বলিল, তোমার কি আজ আর কোন এনগেজমেণ্ট আছে, সুমিত্রা ?

—না, কেন ?

—মিঃ ব্যানার্জ্জি, তোমার স্বামী, কারখানা থেকে কখন ফিরবেন ?

—উনি ? উনি আজ ফিরবেন না, সেখানে রাতে কী একটা মিটিং আছে, সেটা শেষ হতে হতে অনেক দেরী হয়ে যাবে, তাই আমাকে বলে গিয়েছেন রাতটা ওখানেই কাটাবেন এবং কাল খুব ভোরবেলায় চলে আস্‌বেন।

—তোমাকে একেবারে একলাটি থাকৃতে হবে ?

—এত নতুন নয়, প্রবীর। ওঁর চারদিকে এত অসংখ্য কাজ যে তার মধ্যে আমি নিতান্তই বাহুল্য। সহধর্ম্মিণীকে যে স্বামীর ধর্ম্মে বাধা দিতে নেই, শাস্ত্রের এই মোটা অনুশাসনটা ভুলে যেয়ো না, প্রবীর।

মুহূর্ত্তের জন্য প্রবীর ভাবিল। তাহার পর আগ্রহপূর্ণকণ্ঠে বলিল, আমি আজ সন্ধ্যায় তোমার কাছে আস্‌ব সুমিত্রা ?

সুমিত্রা যেন কথাটা শুনিতেই পায় নাই এইভাবে তাহার গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

প্রবীর আবার বলিল, আমরা দুজনেই দৃঢ়শৃঙ্খলে বাঁধা, সুমিত্রা, আইনকানুনের গণ্ডী ছাড়িয়ে অসাবধানতার রাজ্যে পৌঁছ্‌বার কোনই সম্ভাবনা নেই আমাদের। কিন্তু পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব আমরা দাবী করতে পারি এবং সেই দাবীর জোরেই তোমায় প্রশ্ন কর্‌ছি, আমি আস্‌ব সুমিত্রা ?

এ যেন নূতন এক প্রবীর! হঠাৎ-পাওয়া প্রিয়াকে আবার হারাইয়া ফেলার ভয়ে উদ্বিগ্ন দয়িতের কণ্ঠস্বর। সুমিত্রা আর সব পারে, কিন্তু

প্রবীর যখন আকুলভাবে তাহার কাছে সামান্য এই করুণা ভিক্ষা করে তখন সে কিছুতেই তাহাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। তাহা ছাড়া ইহার মধ্যে অন্যায় ত কিছু নাই! স্বামীর বিশ্বাসের অমর্য্যাদা সে করিতেছে না, তাহার বহু পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে মন খুলিয়া একটু কথা বলিবে, এই ত!

বলিল, আচ্ছা, তুমি এসো। ১২ নম্বর সাউথ এণ্ড পার্ক রোড, বালিগঞ্জ। টেলিফোন হচ্ছে সাউথ ২৭৫।

—আমি তা'হলে এখন চল্‌লাম। একটা ট্যাক্সি নিয়েই চলে যাচ্ছি। আমার জন্য সম্পূর্ণ উল্টোপথে তোমার আস্‌বার কোন দরকার নেই।

বাড়ীতে ফিরিয়া প্রবীর সোজা তাহার লাইব্রেরীঘরে ঢুকিল। প্রথমেই তাহার চোখ পড়িল তাহার টেবিলের উপর কাঁচের ফুলদানীটার দিকে। অশোকের সযত্নে রাখা ফুলগুলি শুকাইয়া আসিয়াছে।—বোকা ছেলে, ফুলদানীতে ফুল রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে জল না দিলে যে ফুল শুকাইয়া যাইবে তাহা জানে না!

একটা চুরুট ধরাইয়া প্রবীর আবার সেই সকালবেলার কাগজটা নিয়া বসিল। পড়িবার উদ্দেশ্যে নয়—ভাবিবার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য।

সুমিত্রার সঙ্গে আবার দেখা হইবে—নিভৃতে, কোলাহল এবং কৌতূহলী দৃষ্টির বাহিরে। সম্ভাবনায় প্রবীর বেশ পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন একটা সঙ্কোচ যেন ঘাড় উঁচাইয়া তাহার কল্পনাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। সে সদম্ভে তাহার এই সঙ্কোচবন্ধন কাটাইয়া উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

একটু পরেই প্রমীলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

প্রশ্ন করিল, তুমি বুঝি আজ আমার উপর রাগ ক'রে বাইরে খেতে গিয়েছিলে?

নিস্পৃহকণ্ঠে প্রবীর জবাব দিল, না···একা ভালো লাগ্‌ছিল না, তাই বাইরে চলে গেলাম। রাগ কর্‌ব কেন?

—কোথায় খেলে?

—গ্রেট ইষ্টার্ণে।

—ওঃ।

তাহার পর একটু থামিয়া প্রমীলা বলিল, তুমি আজ এমন ব্যবহার কর্‌লে মনে হ'ল অপরাধটা যেন আমিই করেছি। অথচ অমন দামী শাড়ীটা যে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল সেজন্য তোমার এতটুকুও দুঃখ হ'ল না।

প্রবীর সংক্ষেপে বলিল, দুঃখ-প্রকাশ কর্‌বার সুযোগ ত দেওয়া হয়নি'!

প্রমীলা বেশ শান্ত সুরেই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, প্রবীরের এই সংক্ষিপ্ত শ্লেষে সে তাহার স্থৈর্য্য আবার হারাইয়া ফেলিল। তীব্র কণ্ঠে বলিল, আমার ঘাট হয়েছে তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত কর্‌তে এসেছি। আমার সখের যা' কিছু আছে তা' নষ্ট হয়ে গেলে তুমি যে মনে মনে এতখানি আনন্দলাভ কর তা' জান্‌তুম না, আজ আমার নতুন একটা শিক্ষা হ'ল।

প্রবীর তাহার মূল্যবান্ মুহূর্ত্তগুলি এই প্রকার তুচ্ছ কলহে নষ্ট করিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না। সে প্রমীলার কথার কোন জবাব দিল না।

প্রমীলা রাগে গজ গজ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রবীর তখনও লাইব্রেরী ঘরে একটা ঈজিচেয়ারে শুইয়া রহিয়াছে। সুমিত্রার প্রতি তাহার ভালোবাসার স্মৃতি দূর সমুদ্রের ঢেউএর কান্নার মত তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার গৃহ, তাহার আবেষ্টনী সমস্ত ভুলিয়া যাইয়া সে একাগ্রমনে ভাবিতেছিল তাহার বিগত জীবনের ছোট খাট ঘটনাগুলির কথা। সুমিত্রা এ কী পরশমণি ছোঁয়াইয়া দিয়া গেল যাহার ফলে সমস্ত পৃথিবী আজ প্রবীরের কাছে আবার রূপে, রংএ, আশায় ভরপূর হইয়া উঠিল!

অশোক আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বাবাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিল, বাবা, তুমি শুয়ে আছ যে?

ছেলের আহ্বানে প্রবীর যেন মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিল। বলিল, বড় ক্লান্ত লাগ্‌ছে, বাবা।

তাহার পরই তাহার মনে পড়িল অশোকের জন্য যে খেলনাটা পাঠাইয়াছিল তাহা বোধ হয় গাড়ী হইতে নামানোই হয় নাই। বেয়ারাকে ডাকিয়া বলিল, গাড়ীতে একটা জিনিষ রয়েছে, নিয়ে আয়ত।

অশোক উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিল, কী জিনিষ বাবা? কার জন্য এনেছ?

—তোমার জন্যে, সেই যে মস্ত বড় ঘোড়া তুমি চেয়েছিলে আজ নিয়ে এসেছি।

—সত্যি?···চোখ দুইটা বড় করিয়া অশোক তাহার বাবার দিকে তাকাইল।

বেয়ারা কাঠের ঘোড়াটা আনিয়া লাইব্রেরী ঘরে রাখিল। আনন্দে উৎফুল্ল অশোকের আর দেরী সয় না, সে সুখে মুরুব্বিয়ানাভাবে ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিল।

প্রবীর বলিল, এবার খুশী হয়েছ ত, বাবা?···যাও, তোমার ঘরে নিয়ে যাও, খেলা ক'রোগে।

আটটা বাজিতে মিনিট কুড়ি বাকী। সুমিত্রার ওখানে যাইবার জন্য তৈরী হইয়া প্রবীর আবার লাইব্রেরী ঘরে আসিল। প্রমীলা স্বামীর সাজসজ্জা দেখিয়া প্রশ্ন করিল, আবার বেরুচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—কখন ফির্‌বে?

—তা' দেরী হতে পাবে, দশটা, এগারোটা।

—খেয়ে গেলে না?

—বিশেষ ক্ষিদে নেই। আমার জন্য ঘরে ফ্লাস্কে কফি আর বিস্কুটের টিনটা রেখে দিতে ব'লো। একটু সাপার খেয়ে শুয়ে পড়্‌ব।···আর তুমি বসে থেকো না যেন।

—বেশ।···বলিয়া প্রমীলা ছেলের কাছে চলিয়া গেল।

একটা সিগারেট ধরাইয়া প্রবীর বাহিরে যাইবে এমন সময় প্রমীলা আবার ফিরিয়া আসিল। উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, ওগো একটা কথা শোন···

—কী?···প্রবীর থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল।

—অশোকের ভয়ানক জ্বর হয়েছে, গা' যেন পুড়ে যাচ্ছে।

—সে কী? এই ঘণ্টাখানেক আগে সে কত খুশী হয়ে আমার কাছ থেকে তার ঘোড়াটা নিয়ে গেল, আর এরই মধ্যে জ্বর!

বলিতে বলিতে প্রবীর প্রমীলার সঙ্গে ছেলের ঘরে ঢুকিল। অশোক তাহার ছোট বিছানায় শুইয়া আছে, চোখ রক্তবর্ণ, আয়া কাছে বসিয়া রহিয়াছে।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

বাবাকে দেখিয়া অশোক চীৎকার করিয়া বলিল, আমার কিছু হয়নি' বাবা, আমি তেতো ওষুদ খাবো না !

—না, বাবা, তোমাকে তেতো ওষুদ কেউ খাওয়াবে না। তুমি চুপটি করে শুয়ে থাকো দেখি।···প্রমীলা বলিল।

তাহার পর জিজ্ঞাসুনেত্রে স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিল, তুমি কি তাহ'লে সত্যি বাইরে যাচ্ছ ?

প্রবীর কিছু বলিবার আগেই অশোক চীৎকার করিয়া বলিল, না, বাবা, তুমি আজ আমার কাছে বসে থাক্‌বে। আর সেই লাল ঘোড়ার গল্প বল্‌বে।

প্রবীর তাহার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাইল। আটটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী।

গতানুগতিক ছন্দে জীবনযাত্রাই তাহার ললাটলিপি—ইহার মধ্যে এতটুকু বৈচিত্র্য, এতটুকু উচ্ছৃঙ্খলতা সে আনিতে পারিবে না ! অশোকের আকুল আহ্বানের সম্মুখে তাহার নিজের স্বাধীনতা স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিতেই হইবে !

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রবীর তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নিল। বলিল, আমি কোথাও যাচ্ছি না, বাবা, এখুনি এসে তোমার সাথে গল্প কর্‌ব। তুমি লক্ষ্মী হয়ে মামণির কাছে একটু থাকো, আমি আমার বন্ধুকে একটা টেলিফোন করে বলে আসি, আজ যাওয়া হবে না, কারণ খোকাকে লাল ঘোড়ার গল্প বল্‌তে হবে।

প্রত্যাবর্ত্তন

সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর পর পুরীতে আসিয়াছি।

পুরীর সমুদ্রের ফেনিলোচ্ছল জলরাশি, পুরীসৈকতের বালুকণার মায়া প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু কী-জানি-কেন প্রৌঢ়ত্বের মধ্যাহ্নে আঠারো বৎসরের পুরানো জীবনের ছবি চোখের সাম্‌নে এমন ভাবে ভাসিয়া উঠিল যে একদিন হঠাৎ হাওড়া ষ্টেশনে অন্যান্য স্বাস্থ্যকামীদের সঙ্গে আমিও পুরী এক্সপ্রেসে চাপিয়া বসিলাম। বিচারবুদ্ধি দিয়া তখন ভাবিয়া দেখি নাই—কাজটা কতখানি সঙ্গত হইতেছে। ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে গাড়ী যখন ষ্টেশন প্ল্যাটফর্‌ম্‌-এ আসিয়া পৌছিল তখন যাত্রীদের কোলাহল, কুলীদের চীৎকার আর পাণ্ডাদের আকুল আহ্বানে আমার যেটুকু বুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল তাহাও লোপ পাইবার উপক্রম হইল। কুলী যখন আমার স্যুটকেশটা একটা ট্যাক্সিতে লইয়া গিয়া তুলিল তখন বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতেই হইল, অমিয়নিবাসমে চ'লো···

- সেবারও এই অমিয়নিবাসেই আসিয়া উঠিয়াছিলাম।

পরিবর্ত্তন বেশ কিছু হইয়াছে লক্ষ্য করিলাম। নূতন ম্যানেজার, নূতন চাকর, দারোয়ান, আসবাবপত্রও নূতন। তাহা ছাড়া, আধুনিকতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া ঘরগুলির ব্যবস্থাও বদ্‌লাইয়াছে। প্রত্যেক দুটি ঘরের সঙ্গে একটি বাথরুম এবং যাঁহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের জন্য ড্রেসিং টেবিল, সোফা, আয়নাবসানো আলমারির বন্দোবস্তও আছে। মোট কথা, অমিয়নিবাস স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামদান-বিষয়ে কোন ত্রুটি রাখে নাই।

কিন্তু আমার মনে হইল, এই সব নূতন আয়োজনের মধ্যে আমি যেন কেমন খাপছাড়া, অসংলগ্ন। যে আঠারো বৎসর আমি কলিকাতায় কাটাইয়াছি তাহা যেন পলকের মধ্যে আমার জীবন হইতে অপসৃত হইয়া গেল। অনুভব করিলাম, আমি আটত্রিশ বৎসরের প্রৌঢ় ব্যারিষ্টার মিঃ নরেশ মিত্র নই, আমি যেন কলেজে-পড়া কুড়ি বৎসরের তরুণ যুবক নরেশ।

সুপ্রিয়ার সঙ্গে যেদিন প্রথম অসম্ভাবিতরূপে দেখা হয় সেই মুহূর্ত্ত-গুলির স্মৃতি এতটুকুও ঝাপ্‌সা হইয়া যায় নাই। তখনকার তরুণীদের মধ্যে এযুগের সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য এবং মধুর স্বাধীনতা ছিল না সত্য, কিন্তু সুপ্রিয়া ছিল একযুগ অগ্রগামী। বোধ হয় সেই জন্যই আমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

সুপ্রিয়া তাহার বাবা-মার সঙ্গে অমিয়নিবাসেই আসিয়া উঠিয়াছিল। আমি যে ঘরে থাকিতাম তাহারই পাশে তাঁহারা থাকিতেন। বাবার অসুস্থতার জন্য সুপ্রিয়াকে অধিকাংশ সময় ঘরের ভিতরে থাকিতে হইত, বাহিরে সমুদ্র-স্নানে বা ভ্রমণে তাহাকে কদাচিৎ দেখা যাইত।

অমরবাবুর অসুস্থতা একদিন খুব বাড়িয়া ওঠে এবং তখন পাশের ঘরে আমার ডাক পড়ে। সুপ্রিয়াই আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিল।

সেই প্রথম আহ্বানের সুরটি আমার কানে এখনও বাজিতেছে।

—দেখুন, বাবার শরীর আজ বড্ড খারাপ মনে হচ্ছে, ম্যানেজার মশায়ও নেই, আপনি একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে পারেন ?

ডাক্তার ডাকা, দোকান হইতে ঔষধ আনা, অমরবাবুর পরিচর্য্যা, এই সব বিষয়ে আমার তৎপরতা দেখিয়া আমি নিজেই সেদিন বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। পরে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম, সুপ্রিয়ার আহ্বানই আমাকে প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

তাহার পর নানা কাজে অকাজে সুপ্রিয়াদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনীভূত হয়। আমার কল্পনাবিলাসী মন সুপ্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া অনেক স্বপ্ন রচনা করিতে সুরু করে, যদিও শেষ দিন পর্য্যন্ত ইহার আভাষটুকুও সুপ্রিয়াকে দেই নাই।

বাধা সরিয়া পড়িল তাহাদের পুরীত্যাগের দিন। সুপ্রিয়াকে ডাকিয়া বলিলাম, সুপ্রিয়া, যদি অভয় দাও একটা কথা বলি।

সুপ্রিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার বড় বড় চোখদুটি তুলিয়া আমার দিকে তাকাইল। বলিল, বলুন।

—পুরীর এ কয়টা দিন যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটেছে। এই স্বপ্নকে আমি চিরন্তন ক'রে রাখতে চাই। তুমি যদি অনুমতি কর, তোমার বাবার কাছে আমি বিবাহের প্রস্তাব করি।

সুপ্রিয়ার মুখের ভাব এতটুকুও বদ্‌লাইল না। সে শুধু বলিল—সে হয় না, আমি বাগ্‌দত্তা।

সুপ্রিয়ার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা। আমি তাহার কাছ হইতে ছুটিয়া পলাইলাম। আমার কানে শুধু বাজিতে লাগিল, সে হয় না, আমি বাগ্‌দত্তা!

তাহার পরদিনই আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। পরের মাসেই আমি চলিয়া গেলাম বিলাতে—ব্যারিষ্টারী পড়িতে। তিন বৎসর পর দেশে ফিরিয়া পূর্ণোদ্যমে প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করিলাম। শুনিলাম, অমরবাবু মারা গিয়াছেন, সুপ্রিয়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে সেই ভাগ্যবান্ পুরুষটির সঙ্গে যাঁহার কাছে সে বাগ্‌দত্তা ছিল। ভদ্রলোক পশ্চিমের কোন্ একটা করদরাজ্যে শিক্ষকতা করেন।

আমার জীবনের বেসুরো তার আর সুরে বাঁধিতে পারিলাম না। বাবা-মা'র অশ্রু, ভাইবোন্‌দের অনুরোধ-উপরোধ, বন্ধুদের উপহাস—কিছুই আমাকে টলাইতে পারিল না। সুপ্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া আমি যে সুখস্বর্গ রচনা করিয়াছিলাম তাহা আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলেও তাহার আসনে অন্য কোন নারীকেই আমি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলাম না।

বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। কর্ম্মজীবনের ব্যস্ততা আলস্য-বিধুর অধিকাংশ মুহূর্ত্তই পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত, কিন্তু তবু এমন অনেক সময় আসিত যখন আমার কল্পনা উড়িয়া যাইত তরুণ যৌবনের সেই মদির দিনগুলির দিকে। আর তন্দ্রালস চোখ দুইটি বুজিয়া আমি ভাবিতাম, সুপ্রিয়া অন্যের গৃহলক্ষ্মী, তাহার অনুপম পরিচর্য্যা, স্নেহ ও প্রেম লাভ করিয়া আর একটি জীবন সৌরভমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, আর সেই নিবিড় পরিপূর্ণতার মধ্যে ভাগ্যহত আমার স্মৃতি ক্ষণেকের জন্যও তাহাদের শান্তিময় জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে না। যদি তুলিত, তবে হয়ত আমি খানিকটা সান্ত্বনা পাইতাম, কিন্তু ইহা কল্পনা করিবার মত সাহস আমার ছিল না।

প্রত্যাবর্ত্তন

পুরীর দিকে সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর পা বাড়াই নাই। তাহার পর হঠাৎ একদিন ক্ষণিক খেয়ালের বশে আমার সেই পুণ্যতীর্থে আবার ফিরিয়া আসিলাম।

অমিয়নিবাসের নূতন ম্যানেজারটি অত্যন্ত গল্পপ্রিয়। প্রথম দিনই তিনি আমাকে তাঁহার হোটেলের অনেক খবর দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

—আমি ত এখানে আছি বছর চারেক হ'ল। এর মধ্যে কত লোক যে এখানে এলেন গেলেন তা বলতে গেলে মস্ত বড় একটা ইতিহাস হয়ে যায়। এই ত গেল বছর লক্ষ্মীপুরের রাজা এসেছিলেন তাঁর একদল বন্ধু নিয়ে, সারা হোটেলটা রিজার্ভ ক'রে রেখেছিলেন দু'হপ্তার জন্য। তারপর রোজ সন্ধ্যায় তাঁদের তাসের আড্ডা বসত, সেটা ভাঙ্গত রাত দুটো তিনটেয়···সে যে কি হৈ হৈ কাণ্ড কি বলব!

আমি প্রশ্ন করিলাম, শুধু তাসের আড্ডা?

ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া ম্যানেজার বলিলেন, রাজারাজড়ার কাণ্ড, শুধু তাসের আড্ডা হবে কেন? ষ্টেশন থেকে পানীয় আর আহার যা আসত, তা সামলাতে আমাদের চাকরগুলো রীতিমত হিমসিম খেয়ে যেত! তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, রাজা বাহাদুর ছিলেন অত্যন্ত সচ্চরিত্র, আর কোন নেশাই ওঁর ছিল না।

আমি হাসিলাম। সচ্চরিত্রতার মাপকাঠি যে দেশে বিশেষ শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গপরিহারে, সেখানে রাজা বাহাদুরকে কে না সাধু বলিবে?

—তারপর এবছর পূজোর সময় এলেন কলকাতার বিখ্যাত ধনী মিঃ বাট্‌লিওয়ালা আর তাঁর দুই মেয়ে। বাট্‌লিওয়ালার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, বম্বের লোক যদিও, তবু দুপুরুষ ধরে বাঙ্গলা মুল্লুকেই আছেন, আর নিজেও বাঙ্গালী বিয়ে করেছেন। তাঁর মেয়ে দুটি ছিল অনুপম রূপসী। বাট্‌লিওয়ালা তাঁর মেয়েদের নিয়ে আমাদের হোটেলে এসে উঠেছেন এই খবর যখন ছাড়িয়ে পড়ল তখন এখানে সীট পাবার জন্য সে কী ভীড়, বিশেষ ক'রে বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার যুবকের মহলে। মেয়ে দুটিকে কিন্তু প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। তাদের প্রেমপ্রার্থী সকলকেই তারা সমান ওজনে মিষ্টি হাসি আর অমায়িক ব্যবহারে এমন মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল যে বাট্‌লিওয়ালা পরিবার চলে যাবার পর কারো কাছে এতটুকু নিন্দা শুনতে পাই নি, রুবি রোজির (মেয়ে দুটির নাম) প্রশংসায় ওরা সবাই হয়ে উঠেছিল শতমুখ।

আমি বুঝিতে পারিলাম অভিজাত হোটেল-শ্রেণীর মধ্যে অমিয়নিবাস আজকাল শীর্ষস্থানে। আঠারো বৎসর আগে আমার মত বেকার যুবক, আর অমরবাবুর মত রুগ্ন পেন্সনভোগীই ছিল ইহার প্রতীক অতিথি, আর এখন লক্ষ্মীপুরের রাজা আর বাট্‌লিওয়ালা-দুহিতারাই এখানকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

সসঙ্কোচে আমি জানাইলাম, আমি একজন নগণ্য ব্যারিষ্টার মাত্র।

ম্যানেজারটি অত্যন্ত সপ্রতিভ। আমার পরিচয়ের দৈন্যটুকু এক-প্রকার গায়ে না মাখিয়াই তিনি বলিলেন, ওঃ—আপনিই কল্‌কাতার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ নরেশ মিত্র? আমরা খুবই খুশী হয়েছি আপনি আমাদের এখানে এসে উঠেছেন, বিলিতি হোটেলে যাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

আমি বিনীতভাবে জানাইলাম, আমার খ্যাতি মোটেই নাই। আর বিলিতি হোটেলে না গিয়া অমিয়নিবাসে উঠিয়াছি, এখানে খানিকটা হৃদ্যতা মিলিবে এই আশায়।

ম্যানেজার মহাশয় খুবই প্রীত হইলেন। বলিলেন, আপনাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা ত আমাদের কর্ত্তব্য! তা আপনি কি এই প্রথম এদিকে এলেন?

সত্য গোপন করিলাম। সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর 'আগেকার কাহিনী এই নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে টানিয়া আনায় ত কোন সার্থকতা নাই! বলিলাম, হ্যাঁ, এদিকে আর আসা হয়ে ওঠেনি। আমার এক মক্কেল আপনাদের হোটেলের এত সুখ্যাতি করেছেন যে শুধু আপনাদের এখানে থাক্‌বার লোভেই এবার আমি পুরীতে এসে পড়েছি।

একগাল হাসিয়া ম্যানেজার বলিলেন, বিলক্ষণ!...তা আপনার কোনই অসুবিধে হবে না। এখানে যা যা দেখ্‌বার আছে, হপ্তাখানেকের মধ্যেই আপনাকে দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি। কলকাতায় ফিরে গিয়ে অমিয়নিবাসের সুখ্যাতি আপনাকে করতেই হবে যে!

পুরীর ভূগোল আমি ভুলিয়া যাই নাই, কিন্তু যেন ম্যানেজার মহাশয়ের নির্দ্দেশ মতই চলিতেছি এই ভাব দেখাইয়া আমি পরদিন প্রত্যূষে চলিলাম বি, এন, আর হোটেলের দিকে—সমুদ্রসৈকত নাকি সেখানটায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং জনতাও সেদিকে অপেক্ষাকৃত কম।

একা হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্তিবোধ করিতেছিলাম, বহুদিন এই প্রকার ভ্রমণের অভ্যাস নাই। বি, এন্, আর হোটেলও অনেকখানি পশ্চাতে রাখিয়া যেখানে ধূসর মাটির স্তূপগুলি প্রায় সমুদ্রের কোলে আসিয়া

মিশিয়াছে সেখানে উপস্থিত হইলাম এবং শ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে বালুকণার উপরেই বসিয়া পড়িলাম।

বিপর্য্যস্ত চিন্তার ধারাগুলি লইয়া কতক্ষণ খেলা করিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ আমি অনুভব করিলাম আমি একা নহি। অদূরে আমারই মত উন্মনাভাবে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে একটি আধুনিকা তরুণী।

মেয়েটি আমাকে লক্ষ্য করিয়াছে কিনা বুঝিলাম না। দেখিলাম, সে অনেকক্ষণ ধরিয়া একই ভাবে বসিয়া রহিয়াছে।

তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না। তবে তাহার কেশ এবং বেশবিন্যাস হইতে সহজেই প্রতীত হইতেছিল—সে বাঙ্গালী, নব্যা এবং সরমকুণ্ঠাবিহীনা। তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে আমার মন্দ লাগিতেছিল না।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইল। পশ্চাতে, যেখানে আমি ছিলাম, একবারও দৃক্‌পাত না করিয়া সে আবার সম্মুখের দিকে ধীরে ধীরে হাঁটিতে সুরু করিল।

আমি কৌতূহল বোধ করিলাম। অলস সময় কাটাইবার পক্ষে কৌতূহলের মত বড় ঔষধ বোধ হয় আর নাই। আমিও উঠিয়া পড়িলাম এবং মেয়েটির পশ্চাতে পশ্চাতে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম।

যেখানে মেয়েটি এতক্ষণ বসিয়াছিল তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্য করিলাম—রুমালে বাঁধা একগোছা চাবি পড়িয়া আছে। মনে হইল ভুল করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। আমি ক্ষিপ্রতার সহিত সেটি তুলিয়া লইয়া বেশ দ্রুতগতিতে মেয়েটিকে অনুধাবন করিলাম এবং তাহাকে প্রায় ধরিয়া ফেলিলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন

আমার পায়ের শব্দ বোধ হয় সে শুনিতে পাইয়াছিল। আমি তাহাকে ডাকিবার পূর্ব্বেই সে পিছন ফিরিয়া তাকাইল এবং আমাকে দ্রুত পদক্ষেপে আসিতে দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রৌঢ়ত্বের মধ্যাহ্নে পৌঁছিয়াছি, রীতিমত হাঁফাইতেছিলাম। রুমালে বাঁধা চাবির গোছাটি তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, মাপ কর্‌বেন, এটি কি আপনার?

পলকের জন্য মেয়েটি যেন সরমে রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার পর নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—ও হ্যাঁ, আমি ভুলে ফেলে এসেছিলাম বুঝি?···আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

জিনিষটি তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া দিলাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর আর অপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে কিনা ভাবিতেছিলাম, মেয়েটিই দ্বিধামুক্ত করিয়া দিল। বলিল, আপনি কি এখন ফিরে যাচ্ছেন?

জবাব দিলাম, হ্যাঁ, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

—তা হ'লে চলুন, আমিও ফিরছি, আজ আর বেশী দূর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

আমরা দুইজনে একসঙ্গে সুদীর্ঘ দুই মাইল পথ হাঁটিয়া আসিলাম। আমার প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে মেয়েরা কোন নির্ভর খুঁজিয়া পায় কিনা ইতিপূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, কিন্তু এই মেয়েটি অতি সহজেই আমাকে তাহার জীবনের অনেকখানি ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল

তাহার নাম নন্দিতা, বয়স সতেরো। কলেজে পড়িতেছিল, নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। পুরীতে আসিয়াছে তাহার এক দূরসম্পর্কীয় মামার সঙ্গে—এই মামাই তাহার বর্ত্তমান অভিভাবক। বাবা মারা গিয়াছেন তাহার বয়স যখন সাত, আর মাও চলিয়া গিয়াছেন বছর দুই হইল। সংসারে সে নিতান্তই একা, তাহার কোন ভাই বা বোনও নাই।

—মা'র জন্যই আমার মনটা মাঝে মাঝে বড্ড খারাপ লাগে। বাবা চলে যাবার পর আটটি বছর মা অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাকে মানুষ করেছেন, অথচ আমাকে একমুহূর্ত্তও কিছু বুঝতে দেননি। তারপর মাও যখন চলে গেলেন, আমার এই মামাই এসে আমার ভার নিলেন এবং তখন থেকে আমি খানিকটা অনুভব করতে শিখ্‌লাম, মা আমার কী ছিলেন।

মা'র কথা বলিতে বলিতে নন্দিতার চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

—মামা বলেন, মেয়েদের বেশী লেখাপড়া করে কী হবে, তাই কলেজ ছাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার কিন্তু কাজ ছাড়া জীবন এতটুকুও ভালো লাগে না। তাই মামা যখন বল্‌লেন তীর্থ উপলক্ষে পুরীতে আস্‌বেন, তখন আমিও তাঁর সঙ্গে চলে এলাম। আমি ত আর পুণ্যলোভাতুর হয়ে আসিনি, আমি এসেছি সমুদ্র দেখ্‌তে।...মামা অবশ্যি প্রথমে আমাকে আন্‌তে রাজী হননি, তারপর কী ভেবে আর আপত্তি করলেন না।

নন্দিতার সহজ সাবলীল ভঙ্গীটি আমার বেশ ভাল লাগিতেছিল। আঠারো বৎসর পর পুরীর সমুদ্রসৈকতে আর একটি নারীর মধুর সাহচর্য্য আমার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলিকে কেমন যেন নাড়া দিয়া তুলিতেছিল।

কথা বলিতে বলিতে আমরা অমিয়নিবাসের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিলাম। নন্দিতার কাছে বিদায় লইবার সময় বলিলাম, আমি ঐ কাছের হোটেলেই আছি—আবার বিকেলের দিকে যদি আপনি ওদিকে যান্ দেখা হবে।

নন্দিতা ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া জবাব দিল, আমি ঐ নির্জ্জন জায়গাটাই বেশী ভালবাসি। আজ বিকেলের দিকে আস্তে চেষ্টা করব।

বৈকালবেলা ম্যানেজার আমার সঙ্গে আসিতে চাহিয়াছিলেন, আমি একটা ওজর দেখাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলাম। মনে হইল, তিনি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু নন্দিতার সঙ্গে আবার কথা বলিবার লোভ আমাকে এতখানি পাইয়া বসিয়াছিল যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এড়াইতেই হইল।

এবার বেশীদূর যাইতে হয় নাই। সমুদ্রতীর দিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম নন্দিতা অপেক্ষা করিতেছে।

আমাকে দেখিয়া সে হাস্যমুখী চপলা বালিকার মত ছুটিয়া আসিল। প্রথম সম্ভাষণেই বলিল, আপনার কাছে আমার একটা মস্ত বড় নালিশ আছে কিন্তু!

আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছিলাম না, প্রশ্ন করিলাম, কী নালিশ?

—আমি আপনার চেয়ে অ-নে-ক ছোট, আমায় আপনি নাম ধরে ডাক্‌বেন।

আমি হাসিলাম।—এই ? তথাস্তু।

আবার আমরা হাঁটিয়া চলিলাম, অদ্ভুত আমরা দু'জন। আমার সঙ্গিনী সপ্তদশী তরুণী, হাসিলাস্যের সাবলীলতায় তাহাকে বালিকা বলিলেও চলে, আর আমি প্রৌঢ়ত্বের মধ্যাহ্নে উপনীত, শ্রান্ত বিক্ষুব্ধ। আমাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকা উচিত নয়, কিন্তু তবু আঠারো বৎসর আগেকার প্রমত্ত বাতাস যেন থাকিয়া থাকিয়া বহিয়া একটি সূক্ষ্ম সেতু রচনা করিতেছিল।

—আচ্ছা নন্দিতা, শুধু নাম ছাড়া আর কোন পরিচয়ই ত তুমি দিলে না ? তোমার বাবা কে ছিলেন, কী করতেন, কোথায় থাকতেন ?

—বাবা ? বাবা কাজ করতেন পশ্চিমে, ভরতপুর ষ্টেটস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে। তাঁর নাম স্বর্গীয় সুবিমল বসু। বাবা স্বর্গগত হবার পর আমরা চলে আসি কলকাতায়।

আমি চমকাইয়া উঠিলাম। শুনিতে ভুল হয় নাই ত ?

—তোমার দাদামশায়ের নাম ?

—দাদু ? দাদুকে ত আমি দেখিনি! তাঁর নাম স্বর্গীয় অমর গুহ ; মা'র কাছে শুনেছি আমি জন্মাবার বছর খানেক আগেই উনি মারা গিয়েছিলেন।

—অমর গুহ ? বাঁশপুরের অমর গুহের নাত্নী তুমি ?

আমার স্বরের আকুল বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া নন্দিতা বোধ হয় থতমত খাইয়া গিয়াছিল। ক্ষণেকের জন্য নীরব থাকিয়া বলিল, হ্যাঁ, কেন? আপনি তাঁকে চিন্তেন কি ?

কী উত্তর আমি দিব ? আঠারো বৎসর আগে যে মায়ার বন্ধনে আমি জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম, যে মায়ার মোহনস্পর্শ এখনও আমি

অনুক্ষণ অনুভব করি, ভবিতব্য কি আজ আমাকে আবার সেই মরীচিকার সম্মুখে আনিয়া উপস্থাপিত করিল ?

স্থির করিলাম, সত্য গোপন করিয়া যাইব। অথচ সুপ্রিয়ার কথা জানিবার জন্য আমি এত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম যে নন্দিতার দাদামহাশয়কে আমি আদৌ জানি না এই বিরাট মিথ্যা কথা বলিলেও চলিবে না।

জবাব দিলাম, হ্যাঁ, ছেলেবেলায় আমি অমরবাবুকে একটু আধটু জান্‌তাম, তবে তিনি ছিলেন বয়সে আমার অনেক বড়, গুরুজনের মত। অনেক বছর ধরে তাঁর খবর আমি রাখিনি।

ছিন্নবন্ধন কাহিনীর সূত্র ধরিয়া নন্দিতা বলিতে লাগিল, দাদুকে আমি দেখিনি, তবে দিদিমা আমার জন্মের পরও কিছুদিন বেঁচে ছিলেন। তাঁর কথা অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ে। দিদিমা মারা যাবার পর মা খুব মুষ্‌ড়ে পড়েছিলেন, এও আমার মনে আছে।

সুপ্রিয়া সম্পর্কে সোজা কোন প্রশ্ন করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে পারিতেছিলাম না, যদি নন্দিতা সন্দেহ করিয়া বসে। কিন্তু একজন সহানুভূতিসম্পন্ন শ্রোতা পাইয়া নন্দিতার সঙ্কোচ অনেকখানি চলিয়া গিয়াছিল, প্রগল্‌ভা বালিকার ন্যায় সে তাহার কাহিনী বলিয়া চলিল।

—মা কিন্তু আমায় বড্ড ভালোবাস্‌তেন এবং এটা সবচেয়ে নিবিড়ভাবে অনুভব করেছি বাবার মৃত্যুর পর। তাঁর মনের কোন্‌খানে যেন একটা ক্ষত ছিল, কিন্তু আমি কখনও বুঝ্‌তে পারিনি সেটা কী। শুধু মনে পড়ে, গভীর রাত্তিরে তিনি কখনও কখনও আমায় বুকে চেপে ধ'রে বল্‌তেন, 'নন্দিতা, বড় হয়ে মাকে ভুলে যাস্‌নি যেন—তোর মুখ চেয়েই তোর মা বেঁচে থাক্‌বে।"…অথচ মা ত আমাকেও ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন!

এতক্ষণ আমি নন্দিতার দিকে ভালো করিয়া তাকাই নাই। এবার আমি আমার এই নবীনা বন্ধুটিকে তীক্ষ্ণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলাম।...হ্যাঁ, আমার আঠারো বছর আগেকার সেই সুপ্রিয়াই যেন শ্যামল মেঘের আড়াল হইতে উঁকি দিতেছে। সেই শান্ত আঁখিপল্লব, সেই হাসির আলো, বাঁ কানের পিছনে চূর্ণ কুন্তলের পাশে তিলটি পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই।

কথা বলিতে বলিতে আমরা অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছিলাম। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে নন্দিতার মুখে তাহার মায়ের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আমার মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বোধ হয় নন্দিতা আমার মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল। অনুতপ্তস্বরে বলিল, আমার ছোটখাট কাহিনী বলে আপনার সন্ধ্যাটা নষ্ট কর্‌লাম, কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।

সুপ্তোত্থিতের মত আমি বলিলাম, না, না, সে নয়, নন্দিতা। রাত হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ফেরা উচিত, তাই ভাব্‌ছিলাম।

অমিয়নিবাসে পৌঁছিতে তখনও মিনিট দশেকের পথ বাকী, এমন সময় নন্দিতা হঠাৎ থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমার মামাবাবু আস্‌ছেন বলে যেন মনে হচ্ছে।

তাহার মুখে ভয়ের রেখা, স্বরটাও যেন কাঁপিয়া উঠিল।

নন্দিতার ভুল হয় নাই। ম্লান গোধূলির আলোর মধ্য হইতে অচিরেই একজন স্থূলকায় ভদ্রলোকের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। নন্দিতার কাছে আসিয়া কর্কশকণ্ঠে সীতাংশুবাবু বলিলেন, এই রাতে মেয়ের কোথা যাওয়া হয়েছিল

শুনি? পুরী আস্‌বার জন্যে এত আকুলিবিকুলি, তখন বুঝ্‌তেই পারিনি পেটে পেটে বিদ্যে এত!

লোকটার বর্ব্বর অসভ্যতা দেখিয়া আমি ক্ষেপিয়া উঠিতেছিলাম, কিন্তু আমার ডান বাহুতে একটা সাঙ্কেতিক তর্জ্জনীস্পর্শ অনুভব করিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নম্র অথচ দৃঢ়কণ্ঠে নন্দিতা জবাব দিল, ওদিকে একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম, মামাবাবু। আপনি এত রাগ কর্‌ছেন কেন?—এই ত সবে সন্ধ্যে হ'ল।

দাঁতমুখ খিঁচাইয়া একটা শব্দ করিয়া সীতাংশুবাবু বলিলেন, আমার বাড়ীতে যতদিন আছ এরকম বেহায়াপনা কিছুতেই বরদাস্ত কর্‌ব না নন্দিতা, এ আমি ব'লে রাখ্‌ছি।

বলিয়া সীতাংশুবাবু আমার দিকে তাকাইলেন, যেন আমিই নন্দিতার বেহায়াপনার জন্য দায়ী।

ব্যাপারটা কিন্তু আর বেশীদূর গড়াইল না। নন্দিতা সীতাংশুবাবুর হাত ধরিয়া বলিল, আর এরকম দেরী হবে না মামাবাবু, এখন বাড়ী চলুন।

আমার দিকে তাকাইয়া নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথাটা ঈষৎ হেলাইয়া নন্দিতা চলিয়া গেল। সীতাংশুবাবুও রাগে গজ গজ করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিলেন।

ইহার পর দুইদিন নন্দিতার দেখা পাই নাই। প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় আমি সমুদ্রসৈকতের সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়াছি, উৎসুকভাবে দুটি চঞ্চল

চোখের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছি, কিন্তু আমার নবীনা বন্ধুর কোনও সাড়া মিলে নাই। মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দুরন্ত চিন্তাগুলিকে শাসন করিয়া বলিয়াছি, তাহার মামা অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা পছন্দ করেন না, তাই সে আর কোন অনর্থের সৃষ্টি করিতে অনিচ্ছুক।

তবু মনের আনাচে কানাচে একটি গোপন ইচ্ছা উঁকি মারিয়াছে, বুদ্ধি বিচারশক্তির দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করিয়া আমার হৃদয় চাহিয়াছে, যদি একবারটি নন্দিতা আসিত, যদি একবারটি তাহার অসম্পূর্ণ কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদগুলি আমাকে বলিয়া যাইত!

নন্দিতার মধ্যে সুপ্রিয়াকে আমি যেন নূতনরূপে দেখিতে পাইতেছিলাম। সুপ্রিয়ার সরমকুণ্ঠাবিহীন চরিত্র—যাহা আঠারো বৎসর আগে আমাকে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল—যেন আরও শোভন, আরও শুভ্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সপ্তদশী নন্দিতার হাসিতে, কথা বলায়, গতিভঙ্গীতে।

হঠাৎ খেয়াল হইল, সুপ্রিয়াও ছিল সপ্তদশী। পুরীর বাতাস আঠারো বৎসর আগেও ছিল এমন আন্‌মনা, সমুদ্রের কলস্বরেও ছিল এই রকমের আকুলতা। ভোরের স্বপ্ন এবং সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে সেই হারানো দিনগুলির ধূসর আলোর রূপ নূতন করিয়া দেখিতে পাইলাম।

এ আমার কী হইল? যে সুপ্রিয়া ছিল আমার কাছে শুধু একটা স্মৃতি সে আজ আবার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল কেন? আর যদিই বা সে আসিল, তাহার সপ্তদশীরূপে কেন আসিল? কেন সে জীবনপথে চলার শ্রান্তি লইয়া আমার কছে আসিল না? কেন

সে প্রৌঢ় নরেশ মিত্রের সম্মুখে প্রৌঢ়া সুপ্রিয়ারূপে দেখা দিল না?

মনের গোপন অন্তঃপুর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম। শ্রান্ত শান্ত প্রৌঢ়া সুপ্রিয়াকে দেখিয়া কি আমি এতখানি আনন্দলাভ করিতাম? আমার ভালোবাসা কি সুপ্রিয়াকে তাহার চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন রূপে ও বেশেই দেখিতে চায় নাই? মনে হইল, আমি যেন জন্মদরিদ্র, আমার অনুভূতি যেন দায়িত্ববিহীন, তাই সুপ্রিয়াকে রূপায়িত মূর্ত্তিতে দেখিবার জন্য আমার কোনই আগ্রহ নাই।

কিন্তু নন্দিতা? আমি না হয় নন্দিতার মধ্যে আমার হারানো সুপ্রিয়াকে খুঁজিয়া পাইয়াছি, নিঃস্ব পথিক তাহার পুরাতন আশ্রয়যষ্টিটি লাভ করিয়া যেমন আনন্দ অনুভব করে আমি নন্দিতাকে পাইয়া তেমনই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, কিন্তু নন্দিতা আমার মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মানিত ভদ্রলোক ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইয়াছে কি?

দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় এইসব বিশৃঙ্খল চিন্তাধারা লইয়া খেলা করিতে করিতে আমার মনটাও কেমন বেসুরো হইয়া গেল—আমি আজ প্রথম অনুভব করিলাম, নিখিলের আঙিনায় আমি নিতান্ত একা।

অন্যমনস্কভাবে আমি হোটেলে ঢুকিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতেছিলাম, ম্যানেজার আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনার একটা চিঠি আছে।

আমার চিঠি? আমি ত কাউকে আমার ঠিকানা দেই নাই!

পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল, নিশ্চয় নন্দিতা লিখিয়াছে। দেখিলাম, আমার অনুমান সত্য। সংক্ষিপ্ত চিঠি :

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অত্যন্ত বিপদে পড়ে লিখ্‌ছি, প্রগল্‌ভতা ক্ষমা কর্‌বেন। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা নিতান্ত দরকার, কাল ভোরবেলায় সেখানে আস্‌বেন কি ? —নন্দিতা

সারারাত আমি ঘুমাইতে পারিলাম না। নন্দিতা লিখিয়াছে, সুপ্রিয়ার নন্দিতা, বিপদে পড়িয়াছে, আমার উপদেশ প্রার্থী। এমন করিয়া সুপ্রিয়া ত কখনও আমার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে নাই! নন্দিতার এই অনুরোধ আমি যেমন করিয়া হউক রাখিবই—তাহার লেখার প্রতি অক্ষরে যে আমি সুপ্রিয়ার স্পর্শ অনুভব করিতেছি।···আমি অনুভব করিলাম, আমার প্রৌঢ়ত্বের নিবিড় ছায়ায় লুকানো তরুণ হৃদয়টি যেন নূতন পত্রপুষ্পে বিকশিত হইয়া উঠিল।

নন্দিতা আমার আগেই সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে ছুটিয়া আমার কাছে আসিল। ভীরুকণ্ঠে বলিল, ভেবেছিলাম আপনি আমার চিঠি পান্‌নি।

আমার ভিতরের প্রবীণ ব্যারিষ্টারটি সজাগ হইয়াই ছিল। কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া প্রশ্ন করিলাম, কী হয়েছে নন্দিতা? কী বিপদের কথা তুমি লিখেছ?

সংলগ্ন অসংলগ্ন অনেক কথার স্রোত হইতে আসল কথাটি উদ্ধার করিলাম এই : সীতাংশুবাবু গত দুই বৎসর যাবৎ নন্দিতাকে তাঁহার

গলগ্রহ বলিয়া মনে করিতেছেন, কোন উপায়ে তাহাকে কাহারও হাতে সমর্পণ করিয়া দিলে বাঁচেন। এতদিন স্ত্রীর ভয়ে কিছু করিতে পারেন নাই, এখন পুরীতে নন্দিতাকে একা পাইয়া এক তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধের সহিত বিবাহ স্থির করিয়াছেন। হয়ত এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা গড়াইত না, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে নন্দিতাকে দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছে, পাছে আমি তাহাঁর শুভার্থী বন্ধু হিসাবে কোন বিঘ্ন ঘটাই। তাই তিনি শুভকাজটা অবিলম্বে সমাধান করিয়া ফেলিতে চাহেন এবং আজই রাত্রে নন্দিতার বিবাহ।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে নন্দিতা বলিল, ঐ বুড়োর ঘর আমি কিছুতেই করতে পারব না, নরেশবাবু। আমি ত বিয়ে করতে চাইনে, তবু মামা কেন আমায় গলগ্রহ বলে ভাবেন? আমাকে যদি আর বছর দুই কলেজে পড়াতেন তা হ'লে আমি তাঁর বোঝা হয়ে থাকতাম না কিছুতেই, নিজের কাজ নিজেই খুঁজে নিতাম। এখন যে আমার সে পথও রুদ্ধ, পালিয়ে গিয়েই বা আমি কী করব? আমার যা বিদ্যা তাতে সামান্য একটা চাকুরীও যে জুটবে না।

নন্দিতার কথা শুনিয়া আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলাম। সীতাংশুবাবু যে এতখানি খল প্রকৃতির মানুষ তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। নীচ জেদের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি মেয়েটার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু উপস্থিত কী করা কর্ত্তব্য? আমি কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। শুধু সান্ত্বনা দিবার জন্য নন্দিতাকে বলিলাম, তুমি কিছু ভেবো না, নন্দিতা। আমাকে তোমার বন্ধুভাবে যখন গ্রহণ করেছ তখন আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব আমি তোমাকে সাহায্য করবই।

শুধু একটি প্রশ্ন আছে—এই বিবাহে তোমার আপত্তির অনেক কারণ থাকতে পারে, একটা কারণের কথা আমি জানতে চাই, তোমার মন কি আর কোথাও বাঁধা রয়েছে ?

হাস্যমুখী চপলা নন্দিতা পলকের মধ্যে রাঙা হইয়া উঠিল। নতমুখী থাকিয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না।

—তা হ'লে একটা দিকে জিনিষটা সহজ হয়ে গেল।...আমি সব ব্যবস্থা করছি, তোমার প্রতি আমার উপদেশ, তুমি বিয়ের সময় পর্য্যন্ত তোমার মামাবাবুর বিরুদ্ধাচরণ ক'রো না। কোন প্রকার প্রতিকূলতা পেলেই তিনি আরও রেগে যাবেন এবং হয়ত তোমাকে এমন কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবেন যেখানে তোমার সহায়তায় আসা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে।...শেষ পর্য্যন্ত তোমার এই বিয়ে আমি ঘটতে দেব না এই ভরসা দিচ্ছি, তুমি শান্তধৈর্য্যে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো।

গভীর কৃতজ্ঞতার সুরে নন্দিতা বলিল, আমি জানতাম আপনি উদ্ধারের একটা উপায় বার করবেনই। আমি নিশ্চিন্ত নির্ভরে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

সারাটা দুপুর এবং সন্ধ্যা আমি ভাবিতে লাগিলাম। আমি প্রৌঢ়, আমার মধ্যে তারুণ্যের উচ্ছলতা নাই, কয়েকটা বিষয় আমি বেশ সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছিলাম। নন্দিতার এই বিবাহ যদি আমি ঘটিতে না দেই তবে সীতাংশুবাবুর আশ্রয় হইতে তাহাকে চিরদিনের জন্য চলিয়া আসিতেই হইবে। আর এই বয়সে তাহার মত মেয়ের পক্ষে জীবনযুদ্ধে

একা অবতীর্ণ হওয়া যে অতি কঠিন সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। তাহার ভার নিতে হইবে আমাকেই।

নন্দিতার ভার নিতে আমার কোনই দ্বিধা ছিল না, থাকিতে পারে না, কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম কী ভাবে তাহাকে আশ্রয় দিব। যদিও আমি আজও অবিবাহিত, যদিও আমি প্রৌঢ়, তবু আমার বিবাহের বয়স চলিয়া যায় নাই। এখনও অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আমার সামান্য একটু সহানুভূতিপ্রার্থী হইয়া আমার বাড়ীতে আনাগোনা করেন। নন্দিতাকে আমার গৃহে স্থান দিব কী পরিচয়ে? দুষ্ট লোকের ইতর ইঙ্গিতে নন্দিতার জীবন কি আরও দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে না? তাহার এই তরুণ বিকাশোন্মুখ জীবনে কি একটা ছায়া আসিয়া পড়িবে না? তাহাকে ভালোবাসিয়া আদর করিয়া কয়জন যুবক বিবাহ করিতে রাজী হইবে?

পলকের জন্য মনে হইল, আমি যদি নন্দিতাকে বিবাহ করি তবেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। বয়স আমার যত বেশীই হউক না কেন, আমার মন ত তখনও আঠারো বছর আগেকার মতই সবুজ রহিয়াছে, ভালোবাসার চরম রহস্যত এখনও আমার কাছে অপরিজ্ঞাত। যে রঙীন্ উত্তরীয় দিয়া আমি সুপ্রিয়াকে আবরণ করিতে চাহিয়াছিলাম তাহার আশ্রয়ে ত আর কোন নারীকেই এ পর্য্যন্ত আসিতে দেই নাই।

তাহা ছাড়া, নন্দিতাকে আমি ভালোবাসি। হ্যাঁ, এই ঘটনাসমাবেশের বিক্ষুব্ধ ঘাতপ্রতিঘাতে আজ আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, নন্দিতাকে আমি ভালোবাসি।...নন্দিতা যে শুধু নন্দিতা নয়, সে যে সুপ্রিয়ারও নন্দিতা। তাহার মুখে সুপ্রিয়ার চিহ্নহীন লাবণ্য, তাহার চোখে সুপ্রিয়ার নামহীন কমনীয়তা, তাহার অন্তরে সুপ্রিয়ার দুর্লভ অফুরন্ত

ঐশ্বর্য্য। সুপ্রিয়া আর নন্দিতা যে অভেদাত্মা, সুপ্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া যে রাগরাগিণী আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা কি নন্দিতার মধ্যে আসিয়া প্রত্যুত্তর পাইতেছে না?

কিন্তু নন্দিতার দিকটা আমি একেবারেই ভুলিয়া যাইতেছি! আমি না হয় নন্দিতাকে ভালোবাসি, গভীরভাবে ভালোবাসি, এমন ভালোবাসি যে কোন তরুণ যুবক তাহার সারা হৃদয় দিয়াও তাহাকে ইহার এক-শতাংশ ভালোবাসিতে পারিবে না, কিন্তু নন্দিতা ত আমাকে ভালোবাসে না;- আমি তাহার নমস্য—তাহার প্রীতির অর্ঘ্য পাইবার কোন অধিকারই ত আমার নাই। আমার প্রৌঢ়ত্বই যে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

আচ্ছা, নন্দিতাকে যদি আমি আমার জীবনের সব কথা খুলিয়া বলি? আমার অন্তর্গূঢ় অনুভূতির মর্য্যাদা কি সে বুঝিবে না? সে কি ভাবিবে আমি তাহাকে ভালোবাসি না, ভালোবাসি তাহার মধ্যে যে সুপ্রিয়া লুকানো আছে তাহাকে? আর সে যদি আমার এই আকাঙ্ক্ষাকে উপহাস করে, যদি বলে, এ আপনার মনের খেয়াল, আপনার ঘোরতর কার্য্য-পটুতার একটা উদাহরণ মাত্র?

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, অথচ কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। শুধু কানে আমারই কথাগুলি বাজিতে লাগিল, নন্দিতাকে আশ্বাস দিয়াছি, শেষ পর্য্যন্ত তোমার এই বিয়ে আমি ঘট্‌তে দেব না, তুমি শান্ত ধৈর্য্যে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো।

ভাবিতে ভাবিতে বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কানে আসিল আমাদের ম্যানেজারের স্বর।—ওকি মিঃ মিত্র, আপনি এখনও শুয়ে রয়েছেন, আপনার শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে না ত?

শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িলাম, উঃ, এ যে রীতিমত রাত হইয়া গিয়াছে। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাইলাম, রাত নয়টা!

তৎক্ষণাৎ খেয়াল হইল নন্দিতার বিবাহের লগ্ন যে রাত দশটায়। খুব সময় মতই ম্যানেজার আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন দেখিতেছি!

—আমার বাইরে নেমন্তন্ন আছে, ম্যানেজার মশায়। আমাকে এখ্খুনি যেতে হবে, অজস্র ধন্যবাদ।

কোন প্রকারে কাঁধে একটা চাদর ফেলিয়া আমি সীতাংশুবাবুর বাড়ীর দিকে ছুটিলাম।

বাহিরের ঘর খোলা—যেন আমার জন্যই কে খোলা রাখিয়াছে।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বিবাহের সংক্ষিপ্ত আয়োজন—ষাট বৎসরের এক বৃদ্ধ বরের আসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার বিপরীত দিকে নতমুখী নন্দিতা। সীতাংশুবাবু পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, লগ্নের আর কত দেরী, ঠাকুর মশায়?

লক্ষ্য করিলাম, নন্দিতার চোখের উৎসুক চাঞ্চল্যকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে শান্ত নির্ভর। সুপ্রিয়ার চোখেও আঠারো বৎসর আগে একদিন এই আলো দেখিয়াছিলাম।

আমি সীতাংশুবাবুর সম্মুখে গিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলাম, এ বিয়ে হ'তে পারে না।

সম্মুখে হঠাৎ বজ্রপাত হইলেও সীতাংশুবাবু বোধ হয় এতখানি স্তম্ভিত হইতেন না। কিন্তু অদ্ভুত তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। পলকের মধ্যে

আত্মসংবরণ করিয়া তিনি শ্লেষের সুরে বলিলেন—সে সম্বন্ধে আপনি বল্‌বার কে, মশায়? আমার ভাগ্নীকে আমি যেখানে খুশী বিয়ে দেব, তাতে আপনার এত মাথাব্যথা কেন?

আমি এতটুকুও না দমিয়া আগেরই মত দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, আমি নন্দিতার বন্ধু, তাহার সবচেয়ে বড় আত্মীয়দের চেয়েও বেশী শুভাকাঙ্ক্ষী। এই বৃদ্ধের হাতে আপনি কিছুতেই নন্দিতাকে সমর্পণ কর্‌তে পার্‌বেন না, অন্ততঃ আমি তা হ'তে দেব না।

বর বোধ হয় এতক্ষণ ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, এসব কি সীতাংশুবাবু? ইনি আবার কে?

তীব্রকণ্ঠে সীতাংশুবাবু জবাব দিলেন, ইনি হচ্ছেন আপনার ক'নের বন্ধু··· আজকালকার মেয়ে বিয়ে করার সখ যাঁদের, তাঁদের এরকম দু-একজন বন্ধু বরদাস্ত করতেই হবে, রসময়বাবু, উনিশ শতাব্দীর বেরসিক হ'লে চল্‌বে না।

রসময়বাবু বরের আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। সীতাংশুবাবুকে শাসাইয়া বলিলেন, হতভাগা জোচ্চোর, এই মেয়েকে আমি কিছুতেই বিয়ে কর্‌ব না···তুমি আমায় ঠকিয়ে হাজার টাকা নিয়েছ, আদালতে এর জবাবদিহি কর্‌তে হবে···রসময় করকে তুমি চেন না!

বরও বাঁকিয়া যাইবেন সীতাংশুবাবু ভাবিয়া দেখেন নাই। অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, আপনি রাগ কর্‌বেন না রসময়বাবু, এ একজন বাইরের লোক, ভুল ক'রে এসেছেন। তাই না কি, মশায়?—বলিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া আমার দিকে তাকাইলেন।

সীতাংশুবাবুর এই সমাধানপ্রয়াসে আমি মোটেই বিচলিত হইলাম না। বলিলাম, ভুল করিনি, সব জেনেশুনেই এসেছি।···নন্দিতাকে আমি ক'নের আসন থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

এবার সীতাংশুবাবু নিজমূর্ত্তি ধরিলেন।

—ওসব চালাকী আমার কাছে খাট্‌বে না মশায়। আমি নন্দিতার মামা, আইনের চোখে আমিই তাহার একমাত্র অভিভাবক···বেশী গোলমাল কর্‌বেন ত পুলিশ ডাক্‌ব।

রসময়বাবুও তত্‌ক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সপ্তদশী নন্দিতাকে অঙ্কশায়িনী করিবার লোভটা বোধ হয় তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সীতাংশুবাবুর সঙ্গে গলা মিলাইয়া বলিলেন, যদি ভালো চান্ তবে আপনি মানে মানে সরে পড়ুন, নইলে আপনার বা মেয়ের কারোই মঙ্গল হবে না।

ইহাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিতেও আমার ঘৃণা বোধ হইতেছিল। আমি নন্দিতার হাত ধরিয়া বলিলাম, নন্দিতা, উঠে এসো।

শান্ত নন্দিতা নীরবে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি বলিলাম, আজ থেকে আমিই নন্দিতার ভার নিলাম। যদি আপনাদের সাহস থাকে আদালতে যাবেন, আমি কল্‌কাতার ব্যারিষ্টার মিঃ নরেশ মিত্র।

মুহূর্ত্তের জন্য উভয়েই ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। তাহার পর দুইজনেই সুর মিলাইয়া বলিল, বিয়ের আসন থেকে মেয়ে উঠিয়ে নিলে শাস্ত্রানুসারে মেয়ের আর বিয়ে হয় না সে জানেন, নরেশবাবু?

এবার আমার শ্লেষের পালা। জবাব দিলাম, আমি ব্যারিষ্টার, সে পরিচয় ত আপনাদের আগেই দিয়েছি, শাস্ত্রের এই সোজা কথাটা আমার জানা আছে।

নন্দিতাকে লইয়া আমি ডাউন-এক্সপ্রেসে কলিকাতায় ফিরিতেছি। আমার জীবনের কোন কথাই তাহাকে বলি নাই। সারাটা পথ শুধু ভাবিয়াছি, কঃ পন্থা ?

আমার এই বয়সে হঠাৎ খেয়ালের বশে কাজ করার মত সাহস নাই, সাহস থাকিলেও প্রেরণা পাই না। আমার জীবনী শ্রোতা-শ্রোত্রীর দল আমার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন কি ?

সমাপ্ত